দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

কাশ্মীরে উড়ল গণতন্ত্রের পতাকা
গুলাম নবির উচিত স্যালুট জানানো
—পৃঃ ১৩

দেশকে সুষমামণ্ডিত করে বিদায় সুষমার
— পৃঃ ১৫

৭১ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা।। ১৯ আগস্ট ২০১৯।। ১ ভাদ্র - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



মিশরে শ্রীকৃষ্ণ

এটা কোনো অনুমান নয়, বরং নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক শিলালিপি এবং নথিপত্রের পর্যালোচনা করে সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, ভারত থেকেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি মিশর প্রদেশে এসেছিল, যা পরবর্তী সময়ে 'আমনরা'র মূর্তিতে পূর্ণতা পেয়েছিল।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ১ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৯ আগস্ট - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সুখী কাশ্মীর ও কিছু অসুখী ব্যক্তি ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : মা-বেটা-মা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

কাশ্মীরে বহুশ্রুত কাশ্মীরিয়তের দিন ফেরানোর পথ সুগম হলো ▯ রাহুল শিবশঙ্কর ▯ ৮

দেশের স্বার্থেই ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার জরুরি ছিল ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

কাশ্মীরে উড়ল গণতন্ত্রের পতাকা, গুলাম নবির উচিত স্যালুট জানানো ▯ সুজিত রায় ▯ ১৩

দেশকে সুষমামণ্ডিত করে বিদায় সুষমার ▯ জয়ন্ত ঘোষাল ▯ ১৫

আকাশগঙ্গার মতো ছিলেন সুষমা স্বরাজ ▯ তরুণ বিজয় ▯ ১৭

আজ হঠাৎ ইভিএম ছেড়ে ব্যালটের দাবি কেন? ▯ বরুণ মণ্ডল ▯ ১৮

মিশরে মাখন চোর ▯ ডা: রবীন্দ্রনাথ দাস ▯ ২৩

মহাভারতের ছত্রপতি শ্রীকৃষ্ণ ▯ দুর্গাপদ ঘোষ ▯ ২৬

জন্মাষ্টমী ভারতাত্মাকে জানার উৎসব ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

ইন্দোনেশিয়ার প্রাম্বানান মন্দির ▯ ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ ▯ ৩৩

গল্প : তিনি সবুজ ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩৫

ভারতীয় মুসলমান মহিলাদের নবজাগরণের পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন মোদী ▯ সোমনাথ গোস্বামী ▯ ৩৭

ডাক্তারজী স্বয়ংসেবক, জ্যোতিবাবু ব্রিটিশভক্ত কমিউনিস্ট ▯ অজয় সরকার ▯ ৪১

তুষ্টিকরণের জন্যই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা চালু করেছিলেন নেহরু ▯ নারায়ণ শঙ্কর দাস ▯ ৪৩

বাংলাদেশে বিরোধিতার মুখে ইসকন ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ ▯ **অন্যরকম : ৪২** ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৯**

প্রকাশিত হবে
২৬ আগস্ট
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৬ আগস্ট
২০১৯

আগামী সংখ্যার বিষয়

মুখ ও মুখোশ

জম্মু ও কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের পর আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মুখ ও মুখোশগুলি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসমসাহসিকতা, অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ এবং মার্কসবাদীদের আস্ফালন। সর্বত্র গেল গেল রব। কোলাহলে শামিল হয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও। বহু চেষ্টা করেও আন্তর্জাতিক স্তরে কোনো লাভ হয়নি পাকিস্তানের। ৩৭০ ধারা বিলোপ-পরবর্তী কাশ্মীর স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ে থাকবে বিশ্লেষণাত্মক আলোকপাত।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার



SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতবাসীর শ্রীকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কঠোর এবং কোমলের সমন্বয়ে কৃষ্ণ চরিত্রটি বরাবর আপামর ভারতবাসীর বড়োই আপন। এই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই ভারতবর্ষ তাহার নিত্যদিনের সঙ্গী, তাহার সখা, তাহার পথপ্রদর্শক, তাহার রক্ষক, এমনকী তাহার প্রেমিককেও দর্শন করিয়াছে। যে যে রূপে চাহিয়াছে, ভাগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কাছে সেইরূপেই আবির্ভূত হইয়াছেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কাছে সেইরূপেই আবির্ভূত হইয়াছেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবসময়ই সাড়া দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগিনী গোপাল মা-র কাছে তিনি ধরা দিয়াছিলেন শিশু গোপাল রূপে। গোপাল মা-র নিত্য ক্রীড়ার সঙ্গী ছিলেন তিনি। অপার মাতৃস্নেহের বন্ধনে ধরা দিয়াছিলেন। আবার রানি মীরাবাঈ তাঁহারই ঐশ্বরিক প্রেমে মগ্ন হইয়া রাজ আড়ম্বরের মাঝেও এক সন্ন্যাসিনীর জীবন বাছিয়া লইয়াছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ সখা রূপে। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় পাশা খেলায় পাণ্ডবরা যখন পরাজিত, দ্রৌপদীকে রাজসভায় লাঞ্ছিত করিতে যখন কৌরবরা উদ্যত, তখন দ্রৌপদী শ্রীকষ্ণকেই স্মরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হইয়া কৌরবদের লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন দ্রৌপদীকে। আবার বঙ্গের এক লোককথায় পাই, দরিদ্র বিধবা রমণীর অসহায় পুত্র বনপথে পথ হারাইয়া মধুসূদন দাদাকে ডাকিয়াছিল। মধুসূদন দাদা ভ্রাতা রূপে আবির্ভূত হইয়া সেই অসহায় বালককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভারতবাসী কখনো ভগবান বলিয়া দূর হইতে সশ্রদ্ধ পূজা নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই। বরং, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন একমাত্র ভগবান যাঁহার সহিত নিকটাত্মীয়ের বন্ধন অনুভব করিয়াছে ভারতবাসী। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, তিনি দূরের ভগবান নন, বরং মনের মানুষ।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রটিও নানা রঙে উদ্ভাসিত। কখনও তিনি বৃন্দাবনে শ্রীরাধার মনোহারী। আবার কখনো মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের রথের সারথি। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণই শেষ বয়সে দ্বাকায় যাদবদের মুষল যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া জরা নামক ব্যাধের তিরে বিদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় মানব লীলা ত্যাগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন একমাত্র দেবতা---মহাকবি যাঁহার বর্ণনায় শুধুমাত্র ঐশ্বরিক অলৌকিকত্ব আরোপ করেন নাই। বরং, দোষে-গুণে তাঁহাকেও মানব রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠান শুধুমাত্র মন্দিরের সিংহাসনে নয়। বরং, গোপালের মা-র ধূলি ধূসরিত ঘরেও, নিতান্ত অনটনের মধ্যেই গোপাল রূপে অধিষ্ঠান করিয়াছেন তিনি।

মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের উদ্দেশে তিনি বলিয়াছিলেন, যখনই এই পৃথিবীতে অধর্ম এবং অনাচার প্রবল আকার ধারণ করিবে, তখনই যুগে যুগে তিনি অধর্ম এবং অনাচার বিনাশ করিতে আবির্ভূত হইবেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের ভিতর আমরা প্রত্যক্ষ করি অনাচার এবং অধর্ম দূর করিতে আবির্ভূত এক ভারত-পুরুষকে। মহাভারতে পাণ্ডবরা ছিলেন সত্যের পক্ষে। শ্রীকৃষ্ণ এই পাণ্ডবদের পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়, তাঁহাদের পথপ্রদর্শক রূপে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা পাইয়াছি। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন যখন কৌরবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার সংশয় দূর করিতে বলিয়াছেন, এই লড়াই অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের। অতএব, গাণ্ডীব হস্তে তুলিয়া লও। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছেন, ধর্মরাজ্য এবং সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে অন্যায়ের কিছু নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ভারত-পুরুষ। এই কারণেই ভারতপুরুষ যে, এই ভারতকে তিনি একটি সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন। কত কালের ওঠাপড়া হইল, ইতিহাসে কত সভ্যতার উত্থান-পতন আমরা দর্শন করিলাম---কিন্তু এই শত সহস্র বৎসরের শ্রীকৃষ্ণের গীতার বাণী হইতে ভারতকে কেহ ছিন্ন করিতে পারিল না।

সুভাষিতম্

দিবসেনৈব তৎ কুর্যাদ্ যেন রাত্রৌ সুখং বসেৎ।

যাবজ্জীবং চ তৎকুর্যাদ্ যেন প্রেত্য সুখং বসেৎ।। (বিদূরনীতি)

সারাদিন এত কাজ করতে হবে যাতে রাত্রিতে সুখনিদ্রা হয়। তেমনই সারাজীবন এমন কাজ করতে হবে যাতে মৃতুর পর সদ্‌গতি লাভ হয়।

সুখী কাশ্মীর ও কিছু অসুখী ব্যক্তি

বিশ্বামিত্র-র

কলম

এমন সময় এই প্রতিবেদনটি লিখছি যখন নির্বিঘ্নে কাশ্মীরে ইদ পালিত হয়ে গেছে, ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসও নির্বিঘ্নেই কেটে যাবে এমনটাই আশা করা যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী, এই দুটি দিন নিয়ে কাশ্মীরে প্রতিবছরই যথেষ্ট উত্তেজনা থাকে। এই সময়ই অমরনাথ যাত্রীদের ওপর হামলা, ১৪ তারিখ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে চাঁদ-তারাওয়ালা সবুজ পতাকা উত্তোলন, এসব দেখতে ভারতবাসী অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবে ৩৭০ ধারা আর ৩৫এ ধারা উঠে যাবার পর এই অভ্যাস যে পাল্টে যাচ্ছে তারও আগাম ইঙ্গিত মিলেছে। সাধারণত কাশ্মীরে কার্ফু উঠে গেলেই সেনাবাহিনীর ওপর পাথর ছোঁড়া হতো। এখন ব্যাঙ্ক, দোকান-পাট খুলছে, মানুষজন সারিবদ্ধভাবে এটিএমে লাইন দিয়ে টাকা তুলছেন; ১৪৪ ধারার মাঝেও মানুষ দলে দলে মসজিদে গিয়ে ইদের নামাজ পড়ছেন।

ভেতর থেকে সাংবাদিকদের রিপোর্ট, আর বাইরে থেকে তার যে ছবি ভারতবাসী দেখতে পাচ্ছেন তাতে বেশ সুখী কাশ্মীরের ছবিটাই ধরা পড়ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এমন চকমপ্রদ কাশ্মীরের দৃশ্য কেউ দেখেছেন বলে কল্পনাও করতে পারা যায় না। সুখী কাশ্মীর ভারতবাসীকেও নিশ্চয়ই স্বস্তি দেবে। ৩৭০ আর ৩৫এ ধারা কাশ্মীরকে এতদিন ভারতের থেকে যেন বিচ্ছিন্ন উপত্যকা করে রেখেছিল। আজ যখন জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, শুধু বিভেদকামী ৩৭০ ধারা ও ৩৫এ ধারা উঠে যাওয়াই নয়— কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ এখন জম্মু-কাশ্মীরের ওপর সুদৃঢ় হয়েছে, পাকপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আর কাশ্মীরি যুবকদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর পাথর ছুঁড়তে কিংবা ভারতীয় জনগণের ওপর হামলা চালাতে আর প্ররোচিত করতে পারবে না।

সব মিলিয়ে সুখী কাশ্মীরের পরিস্থিতি এখন গোটা দেশেই 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর এনে দিয়েছে। কিন্তু ভারতের এই সুখী পরিস্থিতিতে কতিপয় ব্যক্তি নেহাত অসুখী বোধ করছেন। তাঁদের কথা বলা দরকার। এই মুহূর্তে সবচেয়ে অসুখী দেশের নাম পাকিস্তান। পাক অধিকৃত যে কাশ্মীর, যা নেহরুর ভুলের মাসুল হিসাবে আজও পাকিস্তানের কবজায়, যে অংশটিকে ভারতের হাতে নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা করেছেন অমিত শাহ, তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটতে এখনও অনেক দেরি। কিন্তু আপাতত ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে পাকিস্তান এখনও যেভাবে কেঁদে-কঁকিয়ে চলেছে তা কূটনৈতিক ভাবে অত্যন্ত বেমানান। কিন্তু অক্ষমের আর্তনাদের মতো ভিক্ষাজীবী দেশ হয়েও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করেছে। ভিক্ষাজীবীকে ভিক্ষা না দিলে দাতার কোনও ক্ষতি হয় না, বরং আর্থিক দু'পয়সা হলেও বাঁচে, কিন্তু ভিক্ষাজীবীর পরিস্থিতি যে কত সঙ্গীন হয় পাকিস্তানের সবজি বাজারেই তার প্রাথমিক ধাক্কায় মালুম হয়েছে।

তবে সবচেয়ে বড়ো রগড় হলো ভারতীয় কূটনীতিককে পাকিস্তান ছাড়তে বলার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত আবদুল বশিরকেও তারা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তবে বশির যে বোমাটা ফাটানোর সেটা ফাটিয়ে দিয়েছেন সফলভাবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গেছে বসির ভারতীয় সাংবাদিক শোভা দে-কে পাকিস্তানের হয়ে লেখার প্রস্তাব দেয় এবং শোভা তাতে সম্মত হয় বলেও ভারতে নিযুক্ত সদ্য প্রাক্তন পাক হাই কমিশনার দাবি করে। আসলে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের এই চেহারাটা আমাদের জানা হয়ে গেছে এতদিনে।

কাশ্মীরে শান্তি ফিরুক, স্থিতাবস্থা ফিরে পর্যটন শিল্প আরও জমজমাট হোক, শুধু যে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী, পাক মদতপুষ্ট শিবিরই এটা চায় না তা নয়, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের একাংশ এবং ইউরো ও পেট্রো ডলার পুষ্ট বুদ্ধিজীবী নামধারীরাও এর বিপক্ষে। যারা মতাদর্শগত ভাবে কমিউনিস্ট এবং ভারতে সেই দেউলিয়া অবলুপ্ত দলটিকে কাগজে-কলমে হলেও এরাই বাঁচিয়ে রেখেছে। 'সেকুলারিজম' যে আসলে এদের গা বাঁচানোর বর্ম, মুখোশ— দেশের মানুষ তা ধরে ফেলেছেন। কারণ মুসলমান দরদ দেখানোর মরিয়া প্রচেষ্টায় নকশাল পরিচালিত কলকাতায় একটি প্রধান মুদ্রিত সংবাদমাধ্যম স্রেফ যে 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদে'র নামে জঙ্গি কার্যকলাপকেই সমর্থন করে তা নয়, সুখী কাশ্মীরকে অশান্ত দেখানোয় এদের তোড়জোড় আর মিথ্যাচার দেখার মতো।

এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে মুখের ওপর সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামী 'মিথ্যুক' বলায় লেফট লিবারালদের আর রাগের সীমা নেই। আসলে নেহরু ও আবদুল্লার পৈত্রিক জমিদারির অবসান অনেকদিন আগেই ঘটেছে, তবে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সেই জমিদারি মেজাজটা ছিল। মোদী আর শাহ মিলে এমন কাণ্ড করছেন যে সেই মেজাজটুকুও এবার চটকে যাচ্ছে। হা, কপাল? ■

মা-বেটা-মা

মাননীয় পাঠক,

দেশ বদলাচ্ছে। ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি হয়েছে। চাঁদের অন্ধকার দিকে চলে গিয়েছে ভারতীয় চন্দ্রযান। কিন্তু কংগ্রেস বদলায় না। সেই গান্ধী পরিবার ভজনা থেকে মুক্তি পায় না।

এবারেও দেখা গেল, গান্ধী পরিবারের বাইরে বেরোতে পারল না কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী সভাপতি হবেন না, মনস্থির করে নেওয়ার পরে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর উপরেই ভরসা দেখালেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতারা। শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কংগ্রেস সভানেত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হলো সোনিয়া গান্ধীর নাম।

কংগ্রেসের নতুন প্রেসিডেন্ট কে হবেন, তা নিয়ে সেদিন মানে ১০ আগস্ট দিনভর বৈঠক করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। এমনকী রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবে দেশের পাঁচটি প্রাদেশিক অঞ্চলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঁচটি কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু তারপরেও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। বেশিরভাগ নেতা রাহুলকেই কংগ্রেসের সভাপতি থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু নিজের অবস্থানে অনড় ছিলেন তিনি। বেটা রাজি না হওয়ায় তাই ফের মা। আর তো কোনও অপশনই নেই।

কংগ্রেস সভানেত্রী হিসেবে আগেও কাজ করেছেন সোনিয়া। সীতারাম কেশরীর পর সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের গ্রাফ যখন নিম্নমুখী, তখন সোনিয়া এসেই পার্টির হাল ধরেছিলেন। একটানা ১৫ বছরের উপর দলের সভানেত্রী ছিলেন সোনিয়া। সভানেত্রী হওয়ার পরে কংগ্রেসকে ক্ষমতাতেও আনেন তিনি। সেই সরকার ১০ বছর টিকেওছিল। কিন্তু তারপর বয়সের কারণে সরে দাঁড়ান সোনিয়া। কংগ্রেসের সভাপতি হন রাহুল গান্ধী। কিন্তু উনিশের লোকসভায় তিনি সফল হননি। তারপরেই সভাপতির পদ ছাড়তে চান রাহুল। তিনি জানিয়েছিলেন, গান্ধী পরিবারের বাইরে থেকে কাউকে কংগ্রেস সভাপতি করা হোক। অন্তবর্তী সভাপতি হিসেবে ৯০ বছর বয়সী মোতিলাল ভোরার নামও ঘোষণা করে কংগ্রেস।

কিন্তু কিছুই হলো না। সেই সোনিয়া। সেই গান্ধী। আসলে যতই সোনিয়া, রাহুল চান না কেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জানত, গান্ধী পরিবারের বাইরে থেকে কাউকে সভাপতি করলে দলকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানো কঠিন। কারণ, সোনিয়ার যে কম্যান্ড রয়েছে, তা দলের সর্বস্তরে কারও নেই। আর কংগ্রেসের এই সংকটের মুহূর্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাউকে গিনিপিগ বানিয়ে কোনও লাভ নেই।

এমনিতেই দল দিশেহারা। চলতি বছরেই বেশ কয়েকটি রাজ্যে ভোট হবে। এদিকে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদটি প্রায় দু'মাস ধরে ফাঁকা পড়ে ছিল। ফলে ভোটের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যায়নি। সংসদেও কংগ্রেসি এমপিদের আচরণে নেতৃত্বহীনতাই ফুটে উঠেছে। বিজেপি লোকসভায় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ করলেও কংগ্রেস সাংসদরা নির্দিষ্ট অবস্থান নিতে পারেননি। কোনও কোনও কংগ্রেস নেতা ওই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছেন। অনেকে আবার সমর্থনই করেছেন বিজেপিকে। মোদী-শাহ জুটি একের পর এক যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাতে কংগ্রেসের সাইনবোর্ড টিকিয়ে রাখাই এখন দায়। সেই অবস্থায় কেই বা দায় নিতে যাবে।

সুন্দর মৌলিক

কাশ্মীরে বহুশ্রুত কাশ্মীরিয়তের দিন ফেরানোর পথ সুগম হলো

অতিথি কলম



রাহুল শিবশঙ্কর

৩৭০ ধারা জারি থাকার মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীরে কেবল 'আমরা- ওরা'র বিভেদই চালু ছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেটি বাতিল হয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলে মোদী সরকার বাকি ভারতের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের মিশে যাওয়াকে আরও পূর্ণতা দেবে। বিশেষ অঞ্চলের তকমার দেওয়াল আর থাকবে না। একই সঙ্গে সরকার জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যটিকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করেছে।

এমন একটা যুগান্তকারী সংস্কারের ফলে যে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এটাই প্রত্যাশিত। লোকসভায় কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, আর জে ডি, সমাজবাদী বা সিপিএম-এর মতো দলগুলি ব্যাপক বাগাড়ম্বর করে জানায় যে, সরকারের এই সিদ্ধান্ত চুপিসারে সংবিধানের ওপর এক দানবীয় আক্রমণ। এর মাধ্যমে কাশ্মীরকে বৃহত্তর ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কাশ্মীরের মূলধারার দলগুলি আবার এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে ধমক দেয় যে এন ডি এ সরকার যদি সত্যিই মনে করে থাকে ৩৭০ ধারা একটি সাময়িক ব্যবস্থা তাহলে তারা জেনে রাখুক কাশ্মীরের ভারত সংযুক্তিও ছিল একটি সাময়িক ব্যবস্থা। পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি ৩৭০ ধারার এই বিলুপ্তিকে কাশ্মীরিদের ওপর বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দিয়ে বলেছেন কেন্দ্র সরকার কাশ্মীরকে এক জেলখানায় পরিণত করেছে। অতীতের যে সমস্ত নেতা বিভাজনের সময় ভারতের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন আজ তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্তের জন্য আপশোষ করছেন। এই সমস্ত মূলধারার কাশ্মীরি রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার অনুকূলে এমনভাবেই ইতিহাসের ব্যাখ্যা করছেন। একই সঙ্গে তাঁরা আইনের ভ্রান্ত পর্যালোচনাকেও প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

আইনগত যুক্তিগুলির বিপক্ষে প্রথমেই বলা দরকার ৩৭০ ধারা একটি আপতকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই জন্ম নিয়েছিল এবং এটি যথাযথ সাংবিধানিক পদ্ধতি অবলম্বনে গঠিত হয়নি এবং কখনই চিরস্থায়ী ছিল না। বিতর্কিত ধারণাটিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ রয়েছে— ''রাষ্ট্রপতি প্রকাশ্য নির্দেশ জারি করে ঘোষণা করতে পারেন যে এই আলোচ্য ধারাটি অমুক তারিখ থেকে আর বলবৎ থাকবে না বা প্রযোজ্য হবে না। তবে, এই ঘোষণার আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভার (constituent assembly) অনুমোদন আবশ্যক। সকলেই জানেন এই আইনসভা বস্তুটি ১৯৫৬ সাল থেকেই উঠে গেছে। তবে এটা ঠিক এই আইনসভা বিলয়ের সময় কখনই ৩৭০ ধারা বাতিলের সম্পর্কে যেমন কিছু উল্লেখ করেনি, তেমনই এটি বরাবরের জন্য সংবিধানের অংশ হয়ে লাগু থাকুক একথাও বলেনি।

> "আজ কাশ্মীরের খুবই প্রয়োজন কাশ্মীরিয়তের পুনরুদ্ধার। এখানকার কুক্ষিগত অঞ্চলগুলি নতুন ভাবনার অভাবে ধুঁকছে। সেখানে নতুন মানুষের প্রবেশ নিতান্ত জরুরি তারাই হবে নতুন চিন্তার দিশারি। এক নতুন কাশ্মীর গড়ে ওঠার সুগন্ধ বাতাসে ভাসমান।"

প্রসিদ্ধ কয়েকজন আইনজ্ঞ বিশিষ্ট আইনজীবী হরিশ সালভের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রী সালভের মতে ৩৭০ ধারার ক্ষমতা বলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি যে কোনো আদেশ জারি করতে পারেন যদি না বিষয়টি ভারতের সঙ্গে আদি বিলয় বা সংযুক্তি পত্রের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ৩৭০ ধারা বিলয়পত্রের অংশ নয়। আর রাষ্ট্রপতি জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মতামত নিয়েছেন। সেই কারণে ৩৭০ ধারা বিলোপের আদেশ বৈধ।"

তাছাড়া ১৯৫০-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির তরফে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের সংবিধানের আওতায় রাখতে ৪০টি নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে। বাস্তবে আজকের যে ৩৭০ ধারা লাগু রয়েছে তাতে এতবার পরিমার্জন করা হয়েছে, তাতে, জম্মু-কাশ্মীরকে অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের ক্ষেত্রেও শুরুতে যে স্বয়ংশাসিত থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল তার চরিত্রও বদলে গেছে। মূল ধারাটি ও তার বিশেষত্ব প্রায় হারাবার মুখে। যখন এই বদলগুলি এসেছিল তখন আজকের রণহুংকার দেওয়া মূলধারার রাজনীতিবিদরা আবদুল্লা ও মুফতির কাশ্মীরে 'কালোদিন' আসার ঘোষণা করছেন তাঁরা নীরব ছিলেন কেন?

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে কাশ্মীরিরা দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা ভারতের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল। তার মানে শুধু এই নয় যে মহারাজা হরি সিংহ

ভারত ভুক্তির চুক্তিতে সই করেছিলেন। কাশ্মীরিরা বিশ্বাস করেছিল আরও গভীর অধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায়। বহুশ্রুত 'কাশ্মীরিয়তের' অন্তর্নিহিত নির্যাস— যে ভ্রাতৃত্বের বোধ তা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল তার তুলনায় ইসলামিক দেশের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ভাবনায় আদৌ খাপ খায়নি। দেশভাগের সময় যে সমস্ত মানুষের এ প্রসঙ্গে মতামত দেওয়া বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা তাঁরা সকলেই এটা জানতেন।

এই কাশ্মীরিয়তের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বহু শতাব্দী আগে কাশ্মীরে যখন বৌদ্ধ বিহারগুলি বিরাজ করত বা বিশাল সংখ্যক হিন্দু যোগী নিজের ভোগবাসনা সংবরণ করার ধর্মতত্ত্ব প্রচার করতেন তখন থেকেই কাশ্মীরি সুফিবাদের উদ্ভব। সেই প্রাচীন সময়ের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় শিখ গুরু নানক তাঁর ঈশ্বর দর্শনাকাঙ্ক্ষা ও সাধনার পূর্ণতা পেতে দেবতার আবাসস্থল এই কাশ্মীরেই এসেছিলেন। হজরতবালের যে তীর্থস্থলে নবি মহম্মদের চুল সংরক্ষিত রয়েছে সেই সংগ্রহালয়ের সংলগ্ন 'পাশ-পহর' বা আদি শঙ্করাচার্যের মন্দির বিরাজমান। সেই সময় কাশ্মীরে যে বহুত্ববাদের প্রসার ঘটেছিল এই সহাবস্থানই তার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু এই ৩৭০ ধারার প্রয়োগে পুরুষ-নারী, কাশ্মীরের লোক, বাইরের লোক, এই ধরনের ভেদাভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার তীব্র ঘৃণার মানসিকতা থেকে কাশ্মীরে আসা অন্যান্য লোকেদের (বিশেষ করে ভারতের অন্য প্রদেশের) বিদেশি আগ্রাসনকারী বলেও তকমা দিয়ে দিয়েছেন।

এই ভাবনার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যখন একজন কাশ্মীরি মহিলা অন্য প্রদেশের মানুষের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর সন্তান সন্ততিকে ছোটো নজরে দেখা হয়। তাদের এক ধরনের বিদেশি যে গোপনে কাশ্মীরের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে এমন শত্রুর দ্বারা উৎপাদিত বলে চিহ্নিত করা হয়। এটি এক চরম বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। এই ভাবে কাশ্মীরি মেয়েদেরও গর্ভজাত সন্তানদের তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। কাশ্মীরি মেয়েরা যাতে রাজ্যের বাইরে তাদের পছন্দের অন্য কাউকে বিয়ে না করে সেই বিষয়টা নিশ্চিত করতেই এমন কদর্য প্রথা চালু রাখা হয়েছে। কাশ্মীরি মহিলাদের এই মৌলিক অধিকারটি সন্তর্পণে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, পাকিস্তানের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে যে সমস্ত হিন্দু শরণার্থী কাশ্মীরে আসে কেন তাদের প্রাপ্য সমান অধিকার দেওয়া হয় না? এ প্রসঙ্গে ১৯৫৬ সালে অন্য প্রদেশ থেকে যে বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মানুষরা সাফাইকর্মী হিসেবে সেখানে যায় এখনও কেন তাদের 'অস্পৃশ্য' আখ্যা দিয়ে চিরকালের জন্য এক ধরনের অসুস্থ, অমানবিক পরিবেশে রেখে দেওয়া হয়েছে? এর জবাব মূলধারার নেতা যারাই পালা করে রাজ্য শাসন করেছেন, তাঁদের দিতেই হবে। ৩৭০ ধারা ও ধারা ৩৫এ-র প্রয়োগের সুবাদে এই ধরনের বিকৃত ও অমানবিক রুচির প্রথাগুলিকে জারি রাখার সাফল্যকেই সেখানকার রাজনীতিকরা সদম্ভে 'বিশেষ মর্যাদা' প্রাপ্ত রাজ্য বলে জাহির করতে অভ্যস্ত।

সত্যি কথা বলতে কী, কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ইনসানিয়ত বা মানবিকতার যে উল্লেখ করা হয় এই ৩৭০ ও ৩৫এ ধারায় সেই গুণটি তিলমাত্র নেই, যা একটি আধুনিক গণতন্ত্রের পক্ষে একান্ত জরুরি। এই ধরনের সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলি কখনই নীতিগতভাবে একটি ন্যায়সঙ্গত ও সকলকে নিয়ে সুসংহত সমাজ গড়ার সহায়ক নয়। যে কারণে জম্মু-কাশ্মীরে এই ধারা কার্যকর থাকাকালীন কোনো মজবুত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি।

কাশ্মীরি রাজনীতিবিদরা এই সত্য যতই অবহেলাভরে অস্বীকার করুন, ৯০-এর দশকে সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের অভ্যন্তরে লালিত পাকিস্তানি জিহাদিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে নিষ্ঠুরতায় হাজার হাজার কাশ্মীরি হিন্দুকে খুন, ধর্ষণ লুঠ করে উপত্যকা ছাড়া করেছিলেন সে ঘৃণ্য কাজ ক্ষমার অযোগ্য।

আজ এনডিএ সরকার কাশ্মীরে দেশি-বিদেশি বিভাজনকারী এই ৩৭০ ধারার ধাঁচা সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে। এই পরিবর্তিত ন্যায় পরায়ণ সমাজে হিন্দু, শিখ বা অন্যান্য বিশ্বাসের মানুষ নিজের অধিকারে প্রবেশ করবেন। বাইরের লোক হিসেবে নয়। আজ কাশ্মীরের খুবই প্রয়োজন কাশ্মীরিয়তের পুনরুদ্ধার। এখানকার কুক্ষিগত অঞ্চলগুলি নতুন ভাবনার অভাবে ধুঁকছে। সেখানে নতুন মানুষের প্রবেশ নিতান্ত জরুরি তারাই হবে নতুন চিন্তার দিশারি। এক নতুন কাশ্মীর গড়ে ওঠার সুগন্ধ বাতাসে ভাসমান।

(লেখক টাইমস নাউ-এর এডিটর ইন চিফ)

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

রম্যরচনা

নাটক

ঘটনাস্থল কোচবিহারের তুফানগঞ্জের ধলপল গ্রাম। নিষ্পাপ এক মুসলমান যুবক হাউ হাউ করে কাঁদছে আর দু'কান ধরে জয় শ্রীরাম বলছে আর ওঠ-বোস করছে। পাশে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন যুবক তাকে এসব করতে বাধ্য করছে। এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। চতুর্দিকে নিন্দার ঝড়।

এগিয়ে এলেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। কারা করেছে এমন কাজ। অনুসন্ধান করতেই বেরিয়ে এল আসল ঘটনা। যাকে কান ধরে জয় শ্রীরাম বলে ওঠ-বোস করানো হচ্ছিল তার নাম আসগর আলি। আর যারা করাচ্ছিল তাদের নেতার নাম মহম্মদ আফসি মিয়া। এরা কেউই বিজেপি নয়। তাহলে ঘটনাটি কী? ঘটনাটি একটি নাটক। দু'পক্ষই তৃণমুলি। মুসলমানরা আজকাল দলে দলে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে, সেটা ঠেকাতেই এক্কেবারে এই তৃণমূলি বাংলা নাটক।

বিজেপি কত খারাপ এটা দেখানোই তাদের উদ্দেশ্য।



উবাচ



"মিশন কাশ্মীরের জন্য অমিত শাহকে অভিনন্দন। মোদী-অমিত শাহ জুটি কৃষ্ণ-অর্জুনের মতো।"

কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপ প্রসঙ্গে

রজনীকান্ত
তামিল সুপারস্টার



"কংগ্রেস থাকলে পরিবার থাকবে আর পরিবার থাকলে কংগ্রেস থাকবে। কংগ্রেসের চেয়ে গান্ধী পরিবার এখন বেশি বিপন্ন।"

কংগ্রেস সভানেত্রী পদে সোনিয়া গান্ধীর নির্বাচন প্রসঙ্গে

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি
সভাপতি তথা সাংসদ



"জওহরলাল নেহরু একজন অপরাধী। কারণ তিনি কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা লাগু করেছিলেন।"

নেহরুর ৩৭০ ধারা লাগু প্রসঙ্গে

শিবরাজ সিংহ চৌহান
মধ্যপ্রদেশের পূর্বতন
মুখ্যমন্ত্রী



"মালালা কাশ্মীরি মুসলমানদের জন্য খুবই চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দু ও বালুচিস্তানের মানুষদের জন্য তাঁর কোনো চিন্তা নেই। মনে হচ্ছে তাঁর নিজের ধর্মের চিন্তাই সর্বোপরি। কিন্তু আপনার ধর্ম যদি আপনার অন্তরাত্মা নষ্ট করে দেয় তাহলে আপনি ভালো মানুষ কখনই নন।"

৩৭০ ধারা বাতিলের পর মালালার মন্তব্য প্রসঙ্গে

তসলিমা নাসরিন
বাংলাদেশি লেখিকা



"সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কংগ্রেসের কীরকম যুগলবন্দি ছিল তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন। কংগ্রেসের এ কী হয়েছে? কোন ভাষায় কথা বলছে তারা?"

৩৭০ ধারা বাতিলের পর কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে

মুখতার আব্বাস নকভি
কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু
উন্নয়ন মন্ত্রী

দেশের স্বার্থেই ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার জরুরি ছিল

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি প্রত্যাশিত ভাবেই আমাদের সংবিধান থেকে ৩৭০ ও তার সঙ্গী ৩৫-(ক) নং অনুচ্ছেদকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ আমাদের দেশে একটা কাঁটা হয়েছিল এতকাল। কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গীভুক্ত রাখার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁর ভ্রান্তি, হঠকারিতা ও অদূরদর্শিতার কারণে এক অদ্ভুত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন— ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ তারই কদর্য পরিচায়ক।

স্বাধীনতার সময় ভারতে অবস্থিত ৫৬২টা দেশীয় রাজ্যকে অবশ্যই ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল— তবে সুযোগ রাখা হয়েছিল আগের অবস্থায় থাকার জন্যও। 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট'-এ বলা হয়েছিল— ওই সব রাজ্যের রাজা/নবাব ওই 'ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেসন'-এ স্বাক্ষর দিয়ে ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। বলা বাহুল্য, ওই আইন কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অধিবাসীদের মত নেওয়ার কথা আদৌ বলেনি--- সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাজা/নবাবের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুসারেই অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগ দিয়েছে, কেউ গেছে পাকিস্তানে।

কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ অবশ্য প্রথম দিকে কোনও ডোমিনিয়ানে যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ পাকিস্তানের উপজাতি ও সৈন্যরা কাশ্মীরে হানা দিয়ে দ্রুত গতিতে রাজধানী শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে আসায় রাজা বিপন্ন অবস্থায় ভারতের সাহায্য চেয়েছেন এবং তার জন্য ইনস্ট্রুমেন্টে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর দিয়েছেন। সুতরাং 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট' অনুসারে কাশ্মীরের ভারতর্ভুক্তি একটা বৈধ ব্যাপার এবং ঐতিহাসিক সত্যি— (কে. বি. কেশওয়ানীর ভাষায়— 'Thus, the state became an integral part of India'— (ইন্টারন্যাশনাল রিলেসান্স, পৃ. ৫৬৬)। এই ব্যাপারে পাকিস্তানের কিছু বলার নেই।

সুতরাং বলা চলে, অন্যান্য যেসব দেশীয় রাজ্য যেভাবে ভারতভুক্ত হয়েছে, সেই একই পদ্ধতিতে কাশ্মীরও হয়েছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটা অঙ্গরাজ্য। কিন্তু পরিস্থিতিকে আরও অনুকূলে আনার জন্য আমাদের সংবিধানে ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে। তার সঙ্গে আনা হয়েছে ৩৫ (ক) ধারাকেও। এই কারণে জি. এন. যোশী মন্তব্য করেছেন, 'The state of Jammu and Kashmir has been treated in the constitution separately and differently from other states'— (দ্য কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৩৪)।

সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদ যদিও ভারতকে 'Union of states' বলেছে, তবু স্বীকার করতেই হবে যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্র। এখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হয়েছে লিখিত আকারে এবং সেই ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রয়েছে ২৯ টা রাজ্য সরকার।

এক্ষেত্রে রাজ্যগুলোর একই স্তরেও একই রকম মর্যাদা নিয়ে থাকার কথা। কিন্তু ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ থাকার ফলে কাশ্মীর পেয়েছিল পৃথক ধরনের অস্তিত্ব ও মর্যাদা। কাশ্মীর অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো একই ভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেও দুর্গাদাস বসুর মতে তৈরি করা হয়েছিল 'separate constitutional relationship'--- (ইন্ট্রোডাক্‌শান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৩০)। এর মূলে ছিল ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ। সঙ্গে ছিল ৩৫ (ক) ধারাও।

এটা লক্ষণীয় যে, একটা বিশেষ পরিস্থিতিতেই এই অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়েছিল— এটা ছিল একটা সাময়িক ব্যবস্থা এবং অস্থায়ী ধারা। জি. এস. পাণ্ডে মন্তব্য করেছেন, 'Art. 370 is a temporary provision. It is not intended to be permanent'— (কন্‌স্টিটিউশনাল ল অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৪৩৯)। সংবিধানে এটাকে 'Temporary, Transitional and Special Provisions' অধ্যায়ে রাখা হয়েছে। দুর্গাদাস বসু মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপতি এটা সংশোধন বা বাতিল করতে পারেন--- সেটা এই অনুচ্ছেদেই আছে— (কন্‌স্টিটিউশনাল ল অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৪২৮)।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই অস্থায়ী বিধানই সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে সগৌরবে সংবিধানে রয়ে গেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত বিচক্ষণতা, বাস্তববোধ ও নিষ্ঠার সঙ্গে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

এই দুটো ধারা থাকার জন্য কতকগুলো অসুবিধা ছিল—

(১) প্রতিরক্ষা, বিদেশ, অর্থ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া কেন্দ্র সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারত না।

(২) সংসদ রাজ্যের সম্মতি ছাড়া সেখানকার জন্য আইন পাশ করতে পারত না।

(৩) জরুরি অবস্থা জারি করা যেত না।

(৪) 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড্' কার্যকর হতো না।

(৫) কাশ্মীরের বাসিন্দাদের দ্বি-নাগরিকত্ব ছিল।

(৬) বিধানসভাই ঠিক করত স্থায়ী বাসিন্দা কারা।

(৭) অন্য রাজ্যের অধিবাসীরা সেখানে জমি কিনতে পারতেন না, এবং

(৮) সেখানকার মেয়েরা বাইরের কাউকে বিয়ে করলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। তাঁদের উত্তরাধিকারীরাও সেটা দাবি করতে পারতেন না।

এবার কিন্তু সব বদলে গেল।

বিশেষ করে, কাশ্মীর হয়ে গেল কেন্দ্র-শাসিত রাজ্য। সেই সঙ্গে লাদাখকেও কেন্দ্রশাসিত করা হয়েছে (তবে কাশ্মীরে

বিধানসভা থাকবে)।

এর ফলে একটা বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে।

প্রথমত, এতদিন রাজ্য সরকার সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়েছে— রাজ্যটা হয়ে উঠেছিল অগ্নিগোলক। এবার কেন্দ্র সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্যে সরাসরি শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তার পার্থক্য দূর হয়ে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি কার্যকর হবে।

তৃতীয়ত, কেন্দ্র কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

চতুর্থত, এই ভূস্বর্গ অত্যন্ত মনোরম। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে পর্যটন শিল্পের উন্নতি ঘটবে, সমৃদ্ধ হবে কাশ্মীর। বাড়বে কর্ম- সংস্থান। পাথর ছুঁড়ে অর্থ জোগাড় করতে হবে না।

পঞ্চমত, অন্য রাজ্যের অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সৃষ্টি হবে নাগরিক সাম্য।

ষষ্ঠত, লাদাখ কেন্দ্রশাসিত হওয়ায় শাসনব্যবস্থাও সুষ্ঠু হতে পারে, দেখা দিতে পারে দক্ষ প্রশাসন।

সপ্তমত, রাজ্যে ৩৫৬নং অনুচ্ছেদ জারি করার সুযোগ থাকবে।

অষ্টমত, ঘরছাড়ারা ঘরে ফিরতে পারবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো— এর জন্য এত সময় লাগল কেন? নেহরুর ভ্রান্তি সংশোধন করা কি অন্য কোনও সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না? তোষণ নীতিই কি ছিল তাদের রাজনীতির একমাত্র হাতিয়ার?

'দ্য স্টেট্‌স্‌ম্যান' মন্তব্য করেছে— এই নিয়ে বিতর্ক ও আইনি জটিলতা থাকতে পারে, কিন্তু 'there can be no question on the boldness of the initiative।' সম্পাদকীয় নিবন্ধের নামও দেওয়া হয়েছে 'Bold Initiative (৬.৮.১৯)। সত্তর বছর ধরে ওই রাজ্যে অরাজকতা, উগ্রপন্থা, দেশদ্রোহিতা ও অস্ত্র-তাণ্ডব চলছে অবাধে। রাজ্য সরকারের মদতে রাজ্যটা হয়ে উঠেছে রক্তযজ্ঞের পীঠস্থান এবং পাকিস্তানের দোসর, অথচ আমাদের শাসকরা ক্ষুদ্র ও ক্লিন্ন স্বার্থে এতকাল কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নেননি। এবারেও কিন্তু কোনও কোনও রাজনৈতিক দল এই ব্যাপারে ব্যাপক আপত্তি তুলেছে।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, কোটি কোটি ভারতবাসী এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ জানাবেন। ড. সুভাষচন্দ্র কাশ্যপ, ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার গাঙ্গুলি, আইনজ্ঞ সাল্‌ভে প্রমুখ গুণীজন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে আছি।

আসলে, আমাদের সামনে আছে দুটো বড়ো সমস্যা— জাতীয় সংহতি (National Integration) ও সন্ত্রাসবাদ। যে ভাবেই হোক, ওর মোকাবিলা করতেই হবে।

জাতীয় সংহতির ব্যাপারে বাধাগুলো হলো ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আঞ্চলিকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ইত্যাদি। এগুলো দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য এনে দিয়েছে। ২০০৫ টা রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বও সৃষ্টি করেছে দ্বন্দ্ব-বিভেদ। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা এবং কাশ্মীরিদের বাড়তি সুযোগ-সুবিধে সেই অন্যায্য বৈষম্যকে আরও কদর্য করে তুলেছিল। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) 'unity and integrity of the nation' অন্যতম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। এস. এল. সিক্রি মনে করেন— কাশ্মীর , গোর্খাল্যান্ড, খালিস্তান ইত্যাদি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড ভারত গঠনের কাজটা ব্যাহত হয়েছে। (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৫৬)। ঐক্যসাধনের কাজটা সাঙ্গ করতেই হবে।

আর সন্ত্রাসবাদ রাজ্যটাকে রক্তস্নাত করে ফেলেছে গত সত্তর বছর ধরে। পাকিস্তান ও কাশ্মীরের উগ্রপন্থীরা হত্যা করেছে হাজার হাজার সৈন্য ও সাধারণ মানুষকে— পেছনে ছিল রাজ্য সরকারের মদত। পাকিস্তান এবারও হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। যুদ্ধের ইঙ্গিতও রয়েছে তাতে। প্রশ্ন তুলেছে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি নিয়ে। কিন্তু এটা ভারতের নিজস্ব ব্যাপার, কারণ আইনগত পদ্ধতিতেই ওই ধারা বিলোপ করা হয়েছে। তাছাড়া কাশ্মীরের গণপরিষদও সেটা মেনে নিয়েছিল। জি. এন. থাপ্পার ভাষায়—'The accession was later confirmed by the constituent Assembly of the stare'—(ফরেন পলিসি অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৭৬)। উপায়ন্তর না দেখে পাক্-উগ্রপন্থীরা সেখানে রক্ত ঝরিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় শাসনই এই নারকীয়তা বন্ধ করার উপায়। সম্প্রতি অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে হয়েছে, ৩৫,০০০ সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছে সেখানে। এই অবস্থায় একটা অকর্মণ্য রাজ্য সরকারকে দিয়ে কাজ চলতে পারে না— দরকার কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ। মোদী সরকার সেই ব্যবস্থা করে প্রায় সমস্ত দেশবাসীর আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করেছেন।

এটা লক্ষণীয় যে, এই ব্যাপারে কয়েকটা রাজনৈতিক দল তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স, পি. ডি. পি. কংগ্রেস, আর.জে.ডি., টি.এম.সি., ডি.এম.কে., সি.পি.আই.(এম.), প্রভৃতি দল, প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছে। কোনও কোনও দলে দেখা গিয়েছে মতভেদ। আবার এনডিএ-র শরিক জেডিইউ সরকারের বিপক্ষে গেছে। এক কথায় বলা চলে— কেউ না বুঝে, কেউ দলীয় স্বার্থে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুবিধে আদৌ বড়ো কথা নয়। সবার ওপরে রয়েছে জাতীয় স্বার্থ। দেশের নিরাপত্তা ও ঐক্যের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত দরকার ছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা— এই অনুচ্ছেদকে রাখা হয়েছিল সংবিধানের সাময়িক ও অস্থায়ী (Temporary, Transtional and Special Provisions) অধ্যায়ে। এ.জি. নুরানীর মতে, এটা এভাবে রাখা হয়েছিল 'for good reasons It contemplates its own death at the most appropriate time'—(ইন্ডিয়া'জ কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ৫৬০)।

সাত দশক কেটে যাওয়ার পর মোদী সরকারই তার কর্তব্য পালন করেছে। তবে এবার দেখতে হবে— তার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কিনা। এটা এখন তাদেরই দায়। ■

কাশ্মীরে উড়ল গণতন্ত্রের পতাকা গুলাম নবির উচিত স্যালুট জানানো

সুজিত রায়

হিন্দু মহাসভা তথা ভারতীয় জনসঙ্ঘের মহান উদ্গাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভারতের জাতীয়তাবাদের মূল তত্ত্ব— 'আগে দেশ পরে ধর্ম' এবং 'এক দেশ এক জাতি'-র প্রয়োগে কেন্দ্রে দ্বিতীয় মোদী সরকার বিপুল জনাশিস নিয়ে যখন জম্মু ও কাশ্মীরে এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান নীতি প্রয়োগে প্রাথমিক পদক্ষেপ নেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন সর্বপ্রথম বিষাক্ত ছোবলের ভয় দেখিয়ে ফণা তুলে ফোঁস করেছিলেন কাশ্মীরের প্রধান বিরোধী দল পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। রীতিমতো উস্কানি দেওয়ার সুরে মন্তব্য করেছিলেন— "Any tampering of Article 370 and 35A will render treaty of accession null and void." অর্থাৎ রীতিমতো দেশদ্রোহের সুর তুলে বলতে চেয়েছেন— সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা বাতিল করলে কাশ্মীর চুক্তিই বাতিল বলে পরিগণিত হবে। তার মানে কাশ্মীর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বলেই ধরে নেওয়া হবে। ৫ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যখন সত্যসত্যই সংবিধানের ওই ধারাগুলি বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দিয়ে 'এক দেশ এক বিধান' নীতির বিজয় নিশান ওড়ালেন, তখন মেহবুবা মুফতির সুরে সুর মিলিয়েই জাতীয় কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদও সেই এক দেশদ্রোহের উস্কানি দিলেন। তিনি আরও স্পষ্ট করেই বললেন— এর ফলে কাশ্মীর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বলেই ধরে নেওয়া হবে। এমনকী লোকসভায় দাঁড়িয়ে জাতীয় কংগ্রেস নেতা এবং দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী (যাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে এবং পারিবারিক ভাবে বহু অর্থনৈতিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে) পি চিদাম্বরমও একটু কৌশল করেই বললেন— আমি ভয় পাচ্ছি, সত্যিসত্যিই ভয় পাচ্ছি যে এর পর হয়ে উঠুক পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতে ভারতবর্ষে লাগামছাড়া জঙ্গি সন্ত্রাসের খোলা আম-দরবার?



জম্মু-কাশ্মীরে হাজার হাজার যুবক দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যান।

ধরে নেওয়া যেতে পারে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস দলের এই দুই প্রধান নেতার বক্তব্য কংগ্রেসেরই বক্তব্য এবং সেখানেই প্রশ্ন উঠে আসে— তাহলে কংগ্রেস কি এতদিন যা চেয়ে এসেছে, আজও তাই চাইছে যে কাশ্মীরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠুক এবং কাশ্মীর

দেশের প্রথম মজবুত গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী ৫ আগস্ট কাশ্মীরে প্রকৃত গণতন্ত্রের পতাকা পুঁতলেন। গুলাম নবির উচিত, সেই পতাকাকে স্যালুট জানানো।

গুলাম নবি আজাদ কাশ্মীরের বাসিন্দা। তাঁর নিশ্চয়ই অজানা নেই, কোন রাজনৈতিক পটভূমিকায় প্রিন্সলি স্টেট জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তৎকালীন এই মর্ত্যের স্বর্গভূমির হিন্দু রাজা হরি সিংহ পাক-আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যই ভারতবর্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন এবং ভারতের সঙ্গে তাঁর রাজ্যের সংযুক্তিকরণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। হরি সিংহ ব্রিটিশ প্রশাসক মাউন্টব্যাটেনকেও চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর রাজ্যকে পাক-আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্যই তিনি ভারতে যোগ দিতে চাইছেন।

পরবর্তী ইতিহাসটা ছিল এক চরম রাজনৈতিক চক্রান্তের যার কুশীলব ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং কাশ্মীরের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা। রাজা হরি সিংহের মর্যাদাকে চরম অসম্মান করে এই দুই 'সহোদর রাজনীতিবিদ' চেষ্টা করেছিলেন ভারতবর্ষের সংবিধান

প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকারকে দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরকে 'স্পেশাল স্ট্যাটাস' দেওয়ার এবং এজন্য সংবিধানে ৩৭০ ধারার খসড়া তৈরি করার। কিন্তু বাবাসাহেব আম্বেদকর নেহরুর ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই কারণে যে, কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য, সুতরাং অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতোই জম্মু ও কাশ্মীরেরও 'এক বিধান'-এর শরিক হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নেহরুর বংশের শিকড় যেহেতু কাশ্মীরেই, প্রথম থেকেই তিনি বুঝেছিলেন, ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোটকে কংগ্রেসের অনুকূলে জিইয়ে রাখতে হবে।

ফলত ৩৭০ ধারার খসড়া করে দেন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার। প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। পরে ষড়যন্ত্র করে কাশ্মীরের মাটিতেই তাঁকে হত্যা করা হয়। সে এক অন্য ইতিহাস।

কিন্তু আজ কংগ্রেস নেতারা অস্বীকার করছেন— আজও ভারত-পাকিস্তানের তিক্ত সম্পর্কের মূল বিষয় হয়ে রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের দখলদারিতে যার বীজ পুতেছিলেন কংগ্রেস সর্বাধিনায়ক জওহরলাল নেহরু। এবং যদিও সংবিধানের ৩৭০ ধারা ছিল 'স্পেশাল প্রভিশন', তাহলে তার মেয়াদ অনেক আগেই কংগ্রেসের দীর্ঘ প্রশাসনিক কালে তুলে দেওয়ার দরকার ছিল। তা হয়নি। সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং সংবিধানের ব্যাখ্যাকারও যখন বলেছেন— Kashmir cannot be in any way different from those arising from the same fact of the other Indian states— তখনও কংগ্রেস কর্ণপাত করেনি। এর সাহায্যে সাধারণ নাগরিক হয়তো ভারতবর্ষের অন্যান্য নাগরিকদের চেয়ে কিছু সুবিধা বেশি পেতেন, কিন্তু তাঁরাও চাইতেন ভারতবাসীর মর্যাদা। কোনোভাবেই তাঁরা শুধু 'মুসলমান' হয়েই বেঁচে থাকতে চাননি।

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলেই কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে হাজার হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিত হিন্দু পরিবারকে। রাজনৈতিক কারণেই কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমান সমাজকে পাক-সন্ত্রাসবাদের হাতের পুতুল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। রাজনৈতিক কারণেই কাশ্মীরকে মর্যাদা দেওয়ার কথা কখনও ভাবেইনি কংগ্রেস। এবং রাজনৈতিক কারণেই রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের মদতেই কাশ্মীর পরিণত হয়েছে সন্ত্রাসবাদের কারখানায়।

ভারতীয় সংবিধানের আর কোনও ধারা নিয়ে কখনও এত দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক ওঠেনি। ৩৭০ ধারা নিয়ে উঠেছে কারণ ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ ধারা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী। জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবোধ বিরোধী। এই আইনটি ছাড়া সংবিধানে আর কোনও আইনই নেই যেখানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বারে বারে। কারণ কাশ্মীর রাজ্যের অনুমতি ছাড়া কাশ্মীরে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না লোকসভা। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনে সেখানে জরুরি অবস্থাও জারি করতে পারেন না যদি না রাজ্য সম্মতি দেয়।

সুতরাং এক অর্থে বলা যেতেই পারে, সংবিধানের ৩৭০ ধারা এতদিন ধরে ভারতবর্ষের বাকি সব রাজ্যের মানুষকে, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের ১৩৫ কোটি ভারতবাসীকে ঠকিয়েছে। ভারতবাসীর করের টাকায় পোষ্য রাজ্য হিসেবে কখনও কোমর সোজা করে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি কাশ্মীর।

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর সুযোগ্য প্রশাসন এবং সংবেদনশীল রাজনীতি কাশ্মীরকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়ে দিয়েছে ৩৭০ ধারা বাতিল করে এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে লাদাখ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়ায়।

কংগ্রেসের উচিত ছিল, অন্যান্য বহু বিরোধী দলের মতো কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে সমর্থন জানানো। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীগুলিকে বোঝানো যে, কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ কাশ্মীরের প্রতি বৈরিতা নয়। কাশ্মীরের উন্নয়নের পথে এক বিশাল পদক্ষেপ। তা না করে কংগ্রেসের অহেতুক বিরোধিতা যে শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্যই তা প্রমাণ হলো আরও একবার।

এই মুহূর্তে কাশ্মীরের সন্তান গুলাম নবি আজাদকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন নরেন্দ্র মোদীর সহযোগিতায় মুরলীমনোহর যোশীর ১৯৯১ সালের ৪৭ দিনের একতা যাত্রার প্রসঙ্গ। একতা যাত্রার পরিক্রমা পথ ছিল কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর। কিন্তু কাশ্মীরে পৌঁছানোর পর জঙ্গি আন্দোলকারীরা একতা যাত্রাকে এগোতে দেয়নি। নরেন্দ্র মোদী নিজেই বলেছেন : ''শ্রীনগরে আমাদের পতাকা পুঁততে বাধা দেয় জঙ্গিরা। তারা চায় ভারতকে ভাগ করতে। এবং তারা প্রকাশ্যে হুমকি দেয়, শ্রীনগরে পতাকা পুঁতলে, আমাদের হত্যা করা হবে। আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। তাদের জানিয়ে এসেছি, আমরা আসব এবং পতাকা পুঁতব।''

দেশের প্রথম মজবুত গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী ৫ আগস্ট কাশ্মীরে প্রকৃত গণতন্ত্রের পতাকা পুঁতলেন। গুলাম নবির উচিত, সেই পতাকাকে স্যালুট জানানো। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**



দেশকে সুষমামণ্ডিত করে বিদায় সুষমার

জয়ন্ত ঘোষাল

বাঙ্গলার তাঁতের শাড়ি খুব ভালবাসতেন সুষমা স্বরাজ। আসলে শাড়ির ব্যাপারে ওঁর ছিল এক বিশেষ আগ্রহ। নানা রাজ্যের নানা ধরনের শাড়ি। শাড়ি নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হতো। সুষমা বলতেন, শাড়ি হলো এক অখণ্ড ভারতেরই প্রতীক। বাঙ্গলার তাঁতের শাড়ি, তামিলনাড়ুর পোচমপল্লি, রাজস্থানের কোটা, সম্বলপুরী, ভাগলপুরের তসর— বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আসলে সুষমার মধ্যে সব সময়ই বিরাজ করত এক ট্রাডিশনাল ভারতীয় নারী। কপালে লাল টিপ, মাথায় চওড়া সিঁদুর। একটু হাইহিল জুতো পরতেন। নিঃসংকোচে বলতেন, 'আমি ছোটোখাটো মানুষ তো'। মঞ্চেও যখন বক্তৃতা দিতে যেতেন তখন তাঁর জন্য একটা ছোটো কিন্তু উঁচু প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হতো। সুষমা তার উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করতেন। তার বক্তৃতা যখন শুরু করতেন তখন ওর ছোটোখাটো শরীর থেকে যেন তেজ প্রকাশ পেত। মনে হতো তিনি এক অন্য মানুষ। হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরাজি তিনটি ভাষাতেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ছিলেন। তবে হিন্দিটা শুনতে সবচেয়ে ভালো লাগত। আজ থেকে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়। যখন ৮৭ সালে প্রথম দিল্লি আসি তখন আমার হিন্দি স্বভাবতই এখনকার চেয়েও আরও খারাপ। তখন ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই নতুন নতুন কিছু হিন্দি শব্দ শিখতাম। লালকৃষ্ণ আদবানীর মাতৃভাষা হিন্দি ছিল না, তাঁর মাতৃভাষা ছিল সিন্ধি। কিন্তু আদবানী বলতেন, 'করাচিতে আরএসএসের শাখা করতে গিয়ে আমি হিন্দি শিখেছি'। সুষমা তো কখনও আরএসএস করেননি কিন্তু তিনি কলেজ জীবন থেকে ছিলেন ডিবেটার। চণ্ডিগড় হরিয়ানায় তার বিতর্ক শুনে রাজনীতি নিরপেক্ষ ভাবে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেতেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লোকদল থেকে এসে সুষমা বিজেপি আরএসএস তথা সঙ্ঘ পরিবারের সংস্কৃতিতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন সকলের।

লালকৃষ্ণ আদবানীই তাঁকে দলে নিয়ে আসেন। জহুরি জহর চেনেন। সুষমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় পাণ্ডারা পার্কে আদবানীজীর পুরনো বাড়িটাতে। তারপর ক্রমশ সম্পর্ক বাড়তে থাকল। আলাপ হলো ওঁর স্বামী স্বরাজ কৌশলের সঙ্গে। স্বরাজ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী। অনেক সময় সংসদের সেন্ট্রাল হলে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় স্বরাজ

সেখানে চলে আসতেন। দুজনে মিলে মধ্যাহ্ন ভোজন সারতেন। কখনও কখনও এই 'পেটুক বামুন'-ও সেখানে জুটে যেত। সুষমা নিরামিষাশী ছিলেন কিন্তু ছুঁতমার্গ ছিল না। আমাকে বলতেন, বাঙ্গালি তুমি কেন নিরামিষ খাবে? ফিশফ্রাইয়ের অর্ডার দিয়ে বলতেন, বাঙ্গালি মাছ খাবে না সেটা কীভাবে সম্ভব? পশ্চিমবঙ্গ নিয়েও সুষমার উৎসাহ খুব প্রবল ছিল। একবার মজা করে বলেছিলেন, জানোতো ছোটো বেলায় যখন শরৎচন্দ্রর শ্রীকান্ত হিন্দিতে পড়েছিলাম, তখন ভেবেছিলাম শরৎচন্দ্র সম্ভবত হিন্দিভাষী, হিন্দি বলয়ের মানুষ। পরে জানলাম তিনি ছিলেন বাঙ্গালি। এরপর রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র হিন্দিতে অনুবাদ পড়তে শুরু করলাম। খুব আনন্দ পেতাম। প্রেমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্র একসঙ্গেই পড়তাম। আমি বললাম, শরৎচন্দ্রর বই হিন্দিতে এত বেশি অনুবাদ হয়েছে, এত হিন্দি ছবি হয়েছে যে এই ধারণাটা হিন্দি বলয়ে একটা জনপ্রিয় ভুল ধারণা। একবার তো এলাহাবাদে একজনের সঙ্গে আমরা রীতিমতো ঝগড়া হয়ে যায়। তিনি কিছুতেই মানতে রাজি নন যে শরৎচন্দ্র বাঙ্গালি। তিনি প্রায় ওকে এলাহাবাদী বলেই ঘোষণা করলেন। আমার এ অভিজ্ঞতার কাহিনি সুষমার এতটাই ভালো লেগেছিল যে এরপর আরও অনেককে তিনি এ কাহিনি জনে জনে বলতেন।

আদবানীর স্ত্রী কমলাদেবী সুষমাকে খুব ভালোবাসতেন। সুষমা জীবনের শেষ দিন পর্যন্তই ছিলেন আদবানী পরিবারের এক সদস্যা। পুত্র জয়ন্ত এবং কন্যা প্রতিভাও ওকে মনে করতেন যেন একজন অভিভাবক। হয়তো বাবাকে কোনও কথা বলা যাচ্ছে না, প্রতিভা সেটা গিয়ে বলত সুষমাকে। ওদের বাড়িতে আদবানীর জন্মদিন, কমলাজীর জন্মদিন অথবা ওদের বিবাহবার্ষিকীতে পিছনের লনে পার্টি হতো। তাছাড়া আদবানীজী ফিল্ম দেখতে ভালোবাসতেন, কত হিন্দি বলিউডের ছবি যে মহাদেব রোডের অডিটোরিয়াম বা সিরিফোর্ট অডিটোরিয়ামে দেখিয়েছেন তার কোনও হিসেব নেই। আদবানীর বাড়ির এমন কোনও অনুষ্ঠান বা সামাজিক পারিবারিক গেটটুগেদার হয়নি যেখানে সুষমা আসেননি। সবচেয়ে মজা হতো দোলের দিন। তখন আদবানীর বাড়িতে এক অসাধারণ দোল খেলা হতো। শুকনো নয়, গিলা হোলি। প্রথমে আবির দিয়ে শুরু হতো, তারপর বিরাট বাথটবে রং গুলে সেই জলে কার্যত স্নান। বাথটবটা হাওয়া দিয়ে ফোলানো বিশাল প্লাস্টিকের। কমলাজী-আদবানীও খেলতেন। সেসব কী আনন্দের দিন ছিল। সুষমা আসতেন খুব সকাল সকাল যাতে ওঁকে রং মাখানো না হয়। আবির দিয়ে আদবানীকে আর কমলাজীকে প্রণাম করে তিনি পালাতে চাইতেন। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে, তাড়াতাড়ি পালানোর সময় হঠাৎ প্রতিভা পিছন থেকে এসে ওর গায়ে ঢেলে দিল এক বালতি রং। সুষমাকে দেখে তখন সবাই হাসছে। সুষমাও হাসতে হাসতে প্রতিভাকে জড়িয়ে ধরে আবির মাখাতে লাগল তার হাতে রাখা স্টক থেকে।

সুষমার সফদরজং রোডের বাসভবনে যেতাম, বাজপেয়ী যে বাড়িটিতে থাকতেন তার পাশ দিয়েই সুষমার বাড়িতে যেতে হতো। ওই বাড়িতেই সুষমার শরীরটা প্রথম খারাপ হতে থাকে। সুগারটা ক্রমশ বাড়তে লাগল। এমন একটা অবস্থা হলো যে ইনসুলিন দেওয়া হতে লাগল। মেয়ে বাঁশরি তখন লন্ডনে অক্সফোর্ডে পড়ছে। বাড়ি ফিরে যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ুন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেন, পরের দিকে তো স্কাইপও করতেন সুষমা। পরে বাঁশরি দিল্লি ফিরে এসে যখন সুপ্রিম কোর্টে প্রাকটিস করতে শুরু করলেন তখন সুষমা এক গর্বিত মা। তবে কখনই কোনও রাজনৈতিক গেট টুগেদারে আমি বাঁশরিকে দেখতাম না। এ ব্যাপারে বোধহয় সুষমার সচেতন কোনো পরামর্শ ছিল।

নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সুষমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিন্তু চিরকাল খুব ভালো ছিল। বরং বলব, প্রমোদ মহাজনের সঙ্গে সুষমা ও মোদীর দূরত্ব বেশি ছিল। আমি বিজেপির জাতীয় কর্ম সমিতির বৈঠক কভার করতে তখন নিয়মিত যেতাম। এখন সময়ের অভাবে বেশিরভাগ বৈঠক দিল্লিতে হয়। তখন কিন্তু তা ছিল না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার এক একটি মেট্রোপলিটন শহরে বৈঠক হতো। কখনও ইন্দোর, কখনও মুম্বই, কখনও কেরল। এসব বৈঠকগুলিতে গেলে সব নেতা-নেত্রী একই হোটেলে একই সঙ্গে থাকতেন। বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় অসাধারণ আড্ডা হতো। তখনই দেখতাম অনেক সময় নরেন্দ্র মোদীর ঘরে সুষমা আসতেন। চা-পকোড়া সহযোগে সেসব সান্ধ্য আড্ডা ছিল অতুলনীয়।

এবার ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে ভোপালে বিজেপির রাজ্য কর্মসমিতির বৈঠক বসল টিকিট বণ্টন নিয়ে। তার আগেই সুষমা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে এবার আর ভোটে দাঁড়াবেন না। কিডনি প্রতিস্থাপনের পর তিনি ভালোই ছিলেন কিন্তু বিদেশমন্ত্রী হিসেবে এত সফর দেখে চিকিৎসকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। সুষমা বলেছিলেন আমার তো একটা দেশ থেকে ফিরতে না ফিরতেই অন্য আর একটা দেশে ছুটতে হয়। আমি বলি একটা জেট ল্যাগ থেকে আর একটা জেট ল্যাগে দৌড়চ্ছি বলে মনে হয়। আমি বললাম আমরা বিদেশ যাত্রার সুযোগ পেলেই মনে হয় যাই যাই। আর আপনি ক্লান্ত।

মোদী কিছু বলার আগেই সুষমাই তাকে বলেন এবার ছুটি চাই। আর ভোটে দাঁড়াব না। মন্ত্রীও হতে চাই না। মোদী আর সুষমার বয়সের ব্যবধান মাত্র এক বছর। মোদী সুষমার চেয়ে এক বছর বড়ো, ৬৮ বছর বয়স। আর অরুণ জেটলি সুষমার চেয়ে এক বছরের ছোটো। মোদী তখনই সুষমাকে বলেছিলেন ভোটে লড়বেন না ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে আমার প্রয়োজন। কী দায়িত্ব তাকে এবার দেবেন মোদী এই নিয়ে গবেষণা চলছিল। কেউ বলছিল, রাজ্যপাল হবেন সুষমা। কেউ বলছিলেন, সুষমা বাগ্মী, তাকে রাজ্যসভায় আনতে আগ্রহী মোদী। হঠাৎ সব গবেষণারই অবসান ঘটিয়ে তিনি বললেন, আলবিদা। চললাম।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

আকাশগঙ্গার মতো ছিলেন সুষমা স্বরাজ

তরুণ বিজয়

যে কেউ শুনেছে, বিশ্বাস করতে পারেনি, বার বার ভাবছে এ খবর নিশ্চয়ই ভুল। সুষমা স্বরাজের হঠাৎ চলে যাওয়া ভরদুপুরে অন্ধকার নেমে আসার মতো অবস্থা। এর কারণ হলো শুধুমাত্র ওঁর স্বভাব। ওঁর বিদ্যা, বাচনভঙ্গিতে সারস্বত প্রভাব এবং ওঁর নিরহংকারিতা।

গত ত্রিশ বছর ধরে তাঁকে জানার, তাঁর সঙ্গে কাজ করার ও তাঁর স্নেহ পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পাঞ্চজন্য পত্রিকার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাঁর বাড়ি থেকে সরস্বতী মূর্তি আনা হতো এবং পরে ওই মূর্তি তিনি নিয়ে যেতেন। ১৯৯৬-৯৭ সালে লাদাখে যখন সিন্ধু দর্শন ও উৎসবের পরিকল্পনা চলছিল তখন তিনি দূরদর্শন কর্তৃপক্ষকে বলে তাড়াতাড়ি ওই বিষয়ে একটি দশ লাইনের সিন্ধুগাথা তথ্যচিত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। আসলে সুষমা স্বরাজ সবার জন্য সমান চিন্তা করতেন। পনেরো বছর পূর্বে তিনি একবার অসুস্থ হয়েছিলেন, খুব কষ্ট ছিল, মনের মধ্যে অনেক খেদও ছিল। আমি দেখা করতে গেলে বললেন— 'তরুণজী ভগবান কৃষ্ণের ইচ্ছাই সব'। সুস্থ হওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ বাদে মন্ত্রী হওয়ার পর একই সংযম, সমান শালীনতা দেখা গেল। তিনি বললেন— 'তরুণজী এটাও কৃষ্ণের কৃপা। তিনি যা চান তাই হয়েছে।'

তিনি কখনও কারও দুঃখ দেখতে পারতেন না। কাউকে আঘাত দিতেন না। কখনও কাউকে কটু কথা, অভদ্র, অশালীন শব্দ ব্যবহার করে লিখতেন না, কারও সম্বন্ধে কটু কথা শুনতেন না। কিছুদিন আগে দেশের মধ্যে খুবই সম্মাননীয় শ্রদ্ধাবান, সন্তান-সম মাঙ্গেরাম গর্গকে শ্রদ্ধা জানানো তাঁর টুইটের বিপরীত টুইট কেউ করেছে, যাতে গর্গজীর মৃত্যু হবারই ছিল, সেখানেও সুষমা এত সুন্দর, ভদ্র ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন, যাতে দেশভর চর্চা হয়েছিল। ভদ্রতা খুবই দুর্লভ গুণ। বড়ো হওয়া সহজ, কিন্তু ভদ্র হওয়া কঠিন। সুষমা ভদ্রতার প্রতিবিম্ব ছিলেন। সেই জন্য তাঁকে অটলজীর মতোই অজাতশত্রু বলা হতো। জরুরি অবস্থার সময় সংঘর্ষ করেছেন, জে. পি.-র আন্দোলনে সবচেয়ে কম বয়সের যুবা নেত্রী ছিলেন। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবিরে যাওয়া, সমিতির অধিকারী শান্তা আক্কা, প্রমীলা তাইজীর সঙ্গে



সর্বদা সম্পর্ক রাখা, প্রখর হিন্দুধর্মের ধ্বজবাহিকার মতো কাজ করা, সমস্ত উৎসবকে রাষ্ট্রীয় রূপ দেওয়া। এই সমস্ত কাজ দেখে সাধারণ কার্যকর্তারা এমনকী যারা সঙ্ঘ বা বিজেপির সঙ্গে জড়িত নয়, তাদেরও মন জুড়ে যেত।

'কারোয়া চৌথ'-এর সময় তাঁর ওখানে যে সমাগম ও ব্রত উদযাপন উৎসব হতো, তা ভারতীয় পরম্পরার এক ঐতিহ্যবাহী সমাগমের সমান। একবার রক্ষা বন্ধনের দিনে আমার বোন আমাকে সময়মতো রাখি পরাতে পারেনি। এ খবর শুনে সুষমা তৎক্ষণাৎ বললেন, আমি আছি, আমি রাখি পরাব। একথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

বিদেশ মন্ত্রণালয় বা কোনো ব্যক্তিগত কাজ থাকলে তিনি নিজে নির্দ্বিধায় অতিথিদের ফোন করে বলতেন, অবশ্যই আসবেন, ভুলবেন না। জগতে এমন কে আছে, এই ফোন পাওয়ার পরও অনুপস্থিত থাকবে। যে কোনো কাজে বিন্দুমাত্র ভুল না করা। অপরের উপর নির্ভরতা কখনও করতেন না। বিভিন্ন দেশের বিদেশ মন্ত্রণালয় বা দূতাবাস অফিসার প্রায়শই ভারতীয়দের প্রতি সংবেদনহীন হয়ে থাকে। সুষমা বিদেশ মন্ত্রণালয়কে বিশ্বব্যাপী স্বদেশ মন্ত্রণালয়ে পরিণত করেছিলেন। যে কোনো ভারতীয় বিশ্বের যে কোনো স্থানে কোনোরকম বিপদে পড়ে যদি সুষমাকে টুইট করে, তৎক্ষণাৎ তার সমাধান হয়ে যেত। এই রকম সহায়তা পেয়ে আফ্রিকা, রাশিয়া, ইউরোপ, আরব, পাকিস্তানে বসে ভারতীয়দের চোখে জল এসে যেত। সুষমা বোন, সুষমাদিদি, আমাদের মা ইত্যাদি। কত মধুর সম্বোধনে তারা দূর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। এরকম কত উদাহরণ— খ্রিস্টান পাদরি, মুসলমান বোন, পাকিস্তানের গীতা, জার্মানির সর্দারজী, আমেরিকাতে বিয়ে হওয়া নববধূ যারা সুষমাজীর বিশ্বব্যাপী স্বদেশ মন্ত্রণালয়ের সাহায্য পেয়েছে।

যে কেউ যে কোনো দলের বা মত-পন্থের হতে পারে, সে সুষমাজীর সঙ্গে সরাসরি সহজেই কথা বলতে পারে, যেন মনে হয় অনেকদিনের পরিচিত। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, পুতিন, শি জিন পিং, ওবামা, আরব দেশের শেখ— সবাই সুষমার কাছে মাথা নামিয়ে নমস্কার করেছেন এবং এমন তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল যে বিশ্বের তাবড় নেতারাও সুষমার সামনে অদ্ভুত বিনয়পূর্ণ ব্যবহার ও সম্মানের ভাব প্রকাশ করতেন।

সুচনা প্রসারণ, স্বাস্থ্য, বিদেশ দপ্তরের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় চালাতে গিয়ে নিজের যোগ্যতার ছাপ রেখে গেছেন। ২৫ বছর বয়সে প্রথম মন্ত্রী হয়ে ৬৭ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ ৪২ বছর ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো অদ্ভুত গরিমার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে এমনই এক আকাশ গঙ্গা ছিলেন যা অনেক উঁচুতে থেকেও সাধারণ মানুষকে শীতল ও সুখকর আত্মীয়তা প্রদান করেছেন। তাঁর জীবনচর্যা, সর্বসাধারণের জন্য এক গুরত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। ভাষার মাধুর্য ও মিষ্টতার জন্য সুষমা স্বরাজ ভারতীয় রাজনীতিতে সরস্বতীর বরপুত্রী ছিলেন। তাঁর কোনো তুলনা নেই, কোনো বিরোধী নেই, নির্ভীক, দৃঢ়। ভাষাতে তাঁর অদ্ভুত দখল ছিল। কর্ণাটকে গিয়ে কন্নড় শিখছেন, গুজরাটে গুজরাটি, তামিনাড়ু গিয়ে তামিল ভাষায় কথা বলেছেন। ওখানকার লোক অবাক হয়ে যাচ্ছে। আমাকে প্রায়ই বলতেন— তুমি তামিলনাড়ুতে কাজ করছ, আমাকে জানাবে, তামিল সংস্কৃতি খুব বিরাট ও মহান। পূর্ব এশিয়ার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। 'লুক ইস্ট' পলিসিকে 'অ্যাক্ট ইস্ট' পরিণত করা তাঁর বিশেষ প্রয়াস ছিল।

দেশে বিদেশে সব সম্প্রদায়ের প্রতি সমভাব, হিন্দুত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, মহিলা জাগৃতি, পরম্পারার প্রতি দিশা, ভাষার সমৃদ্ধি, ভারতের শত্রুদের প্রতি রণচণ্ডী মূর্তি, সমস্ত ভারতীয়র কাছে মাতৃস্বরূপা। এই সুষমা আজ কোথায়?

(লেখক রাজ্যসভার পূর্বতন সাংসদ)

আজ হঠাৎ ইভিএম ছেড়ে ব্যালটের দাবি কেন?

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এখন এক তুমুল আলোচনা। ভোটদান পদ্ধতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দাবি তুলেছেন, ভোটদানের পদ্ধতি হিসেবে ইভিএম বাতিল করে পুরনো আমলের ব্যালট পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল যারা মূলত ভারতীয় রাজনীতিতে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে তারা মমতা ব্যানার্জির এই ব্যালট ফেরানোর দাবিতে সুর মেলাতে শুরু করেছে। ব্যালটের দাবিদাররা কারণ দিয়েছেন ইভিএম নাকি হ্যাক করা সম্ভব। তারা বলতে চাইছেন, ইভিএম যন্ত্রে আগে থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের পক্ষে ভোট করানোর ব্যবস্থা করে রাখা যায়। অর্থাৎ যে বোতাম টিপে ভোট দিন না কেন সবই বিজেপির পক্ষে ভোট পড়ে যাচ্ছে। তাদের আশঙ্কা এই স্পেশাল প্রোগ্রামিং-এর ফলেই বিজেপির এত বেশি পরিমাণে প্রার্থী জিতেছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এই দাবি পত্রপাঠ বাতিল করে দিয়েছেন। তথাপি মমতা ব্যানার্জি তার দাবি থেকে একচুল সরেননি, বরং গত ২১ জুলাই ব্রিগেড সম্মেলনে ব্যালট ফেরানোর জন্য চরমভাবে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন।

ব্যালট পদ্ধতিতে ভোটদান একটা বহুল প্রচলিত এবং পুরনো পদ্ধতি, যা বিশ্বের বেশ কয়েকটি গণতান্ত্রিক দেশে এখনো চলছে। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতে ভোট দানকে রাজনৈতিক দলগুলি একটা প্রহসনে পরিণত করেছে, যা ইদানীং গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে লজ্জাজনক। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে ঘটনা শাসকদল ঘটিয়েছে তাতে ভোট হওয়া মানে নির্বাচনের নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। স্থানীয় এলাকার ক্ষমতাসীন নেতা-নেত্রীদের মদতে হওয়ায় প্রশাসনিক বাহিনী কিংবা ভোটকর্মীদের তোয়াক্কা না করে ভোটকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনেই অবাধে ছাপ্পা চলেছে। যে খরবগুলি পয়সা খাওয়া মিডিয়াগুলি না দেখালেও সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে ধরা পড়েছে। গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছে নির্বাচনকে হাসির নাটক বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ইভিএমের ক্ষেত্রে চুরি বা ছাপ্পা ভোট করার মতন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অতীব কম।

প্রশ্ন হলো, ইভিএমের দ্বারা ২০১১ সালে ক্ষমতা দখল করেছেন যে মমতা ব্যানার্জি, তিনি এখন ব্যালট ফেরানোর দাবি করছেন কেন? তৃণমূল সুপ্রিমো মুখে ব্যালট ফেরানোর সপক্ষে যতই কারণ দেখান না কেন, নির্বাচন কমিশন এবং সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন ব্যালট ফেরানোর আসল কারণ। বিগত আট বছরে রাজ্যের সমস্ত দুষ্কৃতীদের এবং ভোট চুরির মেশিনারি কুক্ষিগত করেছেন মমতা ব্যানার্জি। যা সোশ্যাল মিডিয়াতে 'উন্নয়ন বাহিনী' নামে কুখ্যাত। মমতা ব্যানার্জির সেই উন্নয়ন বাহিনী পুলিশ কিংবা কেন্দ্রীয় বাহিনী কাউকে রেয়াত করে না। তা বিগত নির্বাচনগুলোতে প্রমাণ হয়েছে। ভারতবর্ষের নির্বাচনের ইতিহাসে ভোট গণনা কেন্দ্রে গিয়ে ছাপ্পা ভোট দেওয়া এবং নির্বাচিত অর্থাৎ জয়ী প্রার্থীকে বিজয়ী সার্টিফিকেট না দিয়ে নিজের দলের পরাজিত প্রার্থীর নামে সার্টিফিকেট জোর করে লিখিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা গত নির্বাচনে প্রথম ঘটল, যা আন্তর্জাতিক মিডিয়াকেও অবাক করে দিয়েছে। কিন্তু আসল কথা হলো ক্ষমতালোভী মমতা ব্যানার্জি সারা বিশ্বে কে কি সমালোচনা করলেন সে বিষয়ে তিনি বিশেষ আমল দেন না।

ইভিএম হ্যাক করা কি সম্ভব? জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়াররা ঘোষণা করেছেন যে বর্তমানের ইভিএম হ্যাক করা সম্ভব নয়। তারা বলেছেন মকপোলিং করে ভোট শুরুর আগে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, যে বোতামে ভোট দেওয়া হচ্ছে সেই বোতামেই ভোট পড়ছে কিনা। তাছাড়া যিনি যে চিহ্নে ভোট দিচ্ছেন সাত সেকেন্ডের জন্য তিনি ভিভি প্যাটে সেই চিহ্নের ছবি দেখতে পান। এবং সেই ভোটপ্রদত্ত চিহ্নটি একটি কাগজে ছাপা হয়ে যায়। সুতরাং যে কোনো বোতাম টিপলে একটি বোতামেই ভোট পড়ে সেই দাবি মানা যায় না। যদি ধরেই নেওয়া যায় বিজেপির হয়ে নির্বাচন কমিশন তাদের প্রার্থীকে জেতাবার জন্য আগে থেকে মেশিনে ভোট দিয়ে রেখেছেন তবে ৪২ টি আসনের মধ্যে মাত্র ১৮টি-তে কেন বিজেপি প্রার্থী জিতল? ব্যালট ফেরানোর দাবির কারণ হিসাবে আর একটা বিষয় বলা হচ্ছে যে, লোকসভা পরবর্তী পৌর বা পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলিতে যেখানে নির্বাচন হচ্ছে অধিকাংশ জায়গায় বিজেপির প্রার্থীরা পরাজিত হচ্ছেন। সুতরাং ব্যালটে ভোট হলে বিজেপির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আসলে বিজেপি অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদীর সুদক্ষ প্রশাসনে দেশটি যে সত্যিই ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে চলছে তা আমজনতা বুঝতে পেরেছেন। তাই লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনগণ সেই রাজনৈতিক দলকেই নির্বাচিত করছেন যে রাজনৈতিক দলটি এবং তার প্রধান কাণ্ডারী সৎ সাহসী এবং সুশাসক। প্রান্তিক গ্রামীণ এবং পৌর নির্বাচনে বিজেপির বর্তমান প্রার্থীরা যে সবাই সুদক্ষ এবং সুশাসক তা কিন্তু নয়। তাছাড়া স্থানীয় নির্বাচনে স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রভাব কাজ করে অধিকাংশ ভাবে। সুতরাং সেই সমস্ত নির্বাচনে বিজেপির হার হচ্ছে এটা সুদৃঢ়ভাবে মানা সম্ভব নয়।

মমতা ব্যানার্জি যদি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ধ্বংস দেখতে না চান, তবে অবশ্যই জনতাকে বোকা বানানোর চেষ্টা না করে সঠিক পদ্ধতিতে রাজ্য পরিচালনা করা দরকার। ইভিএমের ধোঁয়া তুলে পুরনো বাতিল হয়ে যাওয়া ব্যালটের দাবি না করে তার উচিত বায়োমেট্রিক ভোট মেশিনের জোরালো দাবি করা। তাহলে তার সততার বিজ্ঞাপনটা আরেকটু উজ্জ্বল হতো। বায়োমেট্রিক ভোটিং মেশিন মানে ভোটারের আঙুলের ছাপ ছাড়া ভোট দেওয়া যাবে না, কিন্তু সেই বাস্তব বুদ্ধি কি মমতা ব্যানার্জির আছে? যদি না থাকে প্রশান্ত কিশোর কেন, কোনো দিগ্‌গজই আগামী একুশে তাঁকে বাঁচতে পারবেন না।

চিঠিপত্র

সতীদাহের কথা কোনো ধর্মগ্রন্থে নেই

এক টিভি চ্যানেলে রাজ্যসভাতে তিন তালাক বিরোধী বিলটি পাশ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এক মহিলা সাংসদ বললেন যে হিন্দুদের সতীদাহের কুসংস্কারের মতো মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে তিন তালাক বন্ধ হলো। বিদেশি স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থে উদ্দেশ্যমূলক ঘৃণা প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা অনেকেই বিশ্বাস করেছি যে ঘৃণ্য সতীদাহ হিন্দুধর্মেরই স্বাভাবিক রীতি। তাই তালাক বন্ধের সঙ্গে সতীদাহকে টেনে আনা হয়েছে। যখন শ্যামনগর থেকে শ্যামবাজারের দিকে বাসে যাই তখন একটি বাসযাত্রীর প্রতীক্ষালয়ে দেখি রাজা রামমোহনের ছবি। নীচে লেখা ভারতীয় কুসংস্কার। লেখাটি পড়ে দুঃখ হয়। ঐতিহাসিক বিভারিজ লিখেছেন যে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যখন বর্বরতা থেকে উপরে উঠতে পারেনি, তার বহু আগেই ভারতবর্ষ একটি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ শুদ্ধ ভাষার জন্ম দিয়েছে যে ভাষায় কঠিন কঠিন বিষয়ে বহু গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ যখন 'ভারতীয় কুসংস্কার' লেখা দেখি তখন দুঃখ হয়। সকলের অবগতির জন্য বলছি সতীদাহ ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিতে ছিল না। বেদ হিন্দুর আদি প্রধান গ্রন্থ। বেদের কোনো মন্ত্রেই সতীদাহ নেই। বৈদিক সমাজে সতীদাহ ছিল না। কাদের জন্যে সতীদাহ শুরু হলো। রামমোহন রচনাবলীতে এ বিষয়ে উল্লেখ নেই। কেন নেই? বিদেশি ভারত আক্রমণকারীরা যে এর জন্যে দায়ী সে কথা আমরা কি জানি?

৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণবাদ দুর্গ দখল করলে দুর্গের সকল হিন্দু নারী তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে নিজেরা আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তাদের সতীত্ব রক্ষা করলেন (Elliot, Vol. 1, p. 172)। এই ঘটনা রাজস্থানে এবং অন্যান্য স্থানে ঘটেছে। সতীদাহ বেদে নেই। সুতরাং এই প্রথা বিদেশি আক্রমণকারীদের অত্যাচারের ফলেই সৃষ্টি। তালাক কিন্তু আছে কোরআন শরিফের সুরা বাকারাহ ২নং সুরায়।

—ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার,
দমদম, কলকাতা-২৮।

ঊনপঞ্চাশ বনাম বাষট্টি

'জয় শ্রীরাম স্লোগানের' জন্ম রাম মন্দির নির্মাণের আন্দোলনের শুরু থেকে। কিন্তু এই স্লোগানকে বিখ্যাত যিনি করেছেন তিনি আর কেউ নন, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাত শান্ত একটি স্লোগানকে অযথা এ রাজ্যের নেত্রী জাতীয় স্বীকৃতি দিলেন। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সময়ে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানকে যেভাবে আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, তা প্রকৃতপক্ষে এ রাজ্যে তাঁর দলের পরাজয়ের অন্যতম কারণ বলে মনে করে সংশ্লিষ্ট মহল। আর তাঁর এই প্রতিক্রিয়া জাতীয় রাজনীতিতে এই স্লোগানটিকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেশের তাবড় তথাকথিত বিদ্বজ্জনেরা এই স্লোগানটিকে War cry হিসেবে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। এঁদের ৪৯ জনের মধ্যে আবার ২২ জন বাঙ্গালি। যে ৪৯ জন এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের প্রায় সবারই দেশের একটি পরিচিত রাজনৈতিক চিন্তাধারার দলের সঙ্গে পুরাতন সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা যেভাবে সারা দেশে গণপিটুনিতে হত্যার সঙ্গে স্লোগানটিকে জুড়ে দিয়েছেন তারই জবাবে দেশের ৬২ জন বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদ করেছেন। ৪৯ সদস্যের পত্র প্রেরকরা যেভাবে বিজেপিকে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তারই উত্তরে তাঁরা বলেছেন যে, তাঁরা কাশ্মীরে যেভাবে সৈন্যদের পাথর ছোঁড়া হয়, যেভাবে নকশালরা নিরপত্তারক্ষীদের নির্বিচারে হত্যা করে তার বিরুদ্ধে এই ৪৯ জন বিদ্বজ্জন নীরব কেন? এ রাজ্যেও বিপক্ষ রাজনীতিকে গলাচাপা দিতে শাসক দল যেভাবে উদ্যোগী তার বিরুদ্ধেও এইসব বিদ্বজ্জনরা নীরব। এ রাজ্যে ক্যানিং, দেগঙ্গা, দেঙ্গায় দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজাকে নিয়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গিয়েছে সাম্প্রতিক অতীতে তাঁর বিরুদ্ধে তো এই ৪৯ জনের কলম থেকে এক বিন্দু কালি খরচ হয়নি। হত্যামাত্রই নিন্দনীয়। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই, তবুও এই পক্ষপাতিত্ব কেন? এই বিদ্বজ্জনেরা একবারও প্রতিবাদ করেন না যখন ইশরত জাহান হনুমান চল্লিশা পড়লে তাঁরই ধর্মের মানুষ তাঁকে আক্রমণ করে। ইশরাত তিন তালাকের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা লড়েছেন। এছাড়া গণপিটুনির ঘটনা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলায় প্রশ্ন এবং আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের অধীনে, তাই এই ৪৯ জন বিদ্বজ্জন বিষয়টাকে প্রধানমন্ত্রী স্তরে না জানিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে লিখতে পারতেন, কারণ গণপিটুনির ঘটনা কিন্তু কংগ্রেস পরিচালিত মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানেও ঘটেছে।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী।

উত্তর মালদার কলেজগুলিতে পরীক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয়

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজে স্নাতক পরীক্ষায় ২০১৯ সাল থেকে সি.বি.সি.এস. নামক অত্যন্ত জটিল এক পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রথম সেমিস্টার (পরীক্ষা) হবে আগামী ডিসেম্বরে অথচ মালদহের কলেজগুলোতে বিশেষ করে চাঁচল কলেজ, হরিশচন্দ্রপুর কলেজ, সামসি কলেজ, গাজোল কলেজ প্রভৃতিতে প্রথম বর্ষের ভর্তি এখনও শেষ হয়নি। আগস্ট মাস থেকে প্রায় একমাস ধরে বি.এ সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা চলবে। গোটা অক্টোবর মাসে পুজোর ছুটি থাকবে। চাঁচল কলেজে ভর্তি নিয়ে ভয়ানক অব্যবস্থা চলছে। কলেজে প্রায় প্রতিদিনই মারপিঠ হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে এসে ভর্তি হতে পারছে না। যে কিছু সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়েছে তাদেরও ক্লাস হচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরি থেকে বই পাচ্ছে না। সমস্ত ক্লাস বন্ধ হয়ে আছে। প্রতিদিনই কলেজে পুলিশ আসছে। চাঁচল

ফঃ ৩

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের টাকা থেকে পুলিশ টিফিন খাচ্ছে। দুই মাস পরেই প্রথম সেমিস্টার। ছাত্র-ছাত্রীরা এই সেমিস্টারের ব্যাপারে কিছুই জানে না। ক্লাস না হলে তারা কিছু বুঝতেই পারবে না। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার ব্যবস্থা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনোকিছুই জানাচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে মৃত্যুফাঁদ অপেক্ষা করে আছে। উত্তর মালদার কলেজগুলোতে কোনোই প্রিন্সিপাল নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি না হতে পেরে কান্নাকাটি করছে। গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—তনুশ্রী দাস,
সিহিপুর, চাঁচল, মালদহ।

আদর্শের সংকটে অস্তিত্বহীন কমিউনিস্টরা

সালটা ছিল ১৯২০। তাসখণ্ডে স্থাপিত হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় এই পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টার ন্যাশনালের ভারতীয় সেকশন হবে। তখন থেকেই শুরু হয় বিদেশি নেতাদের নির্দেশে এদেশের কমিউনিস্টদের যাত্রা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে জানা যায় যে 'জিন'-এর প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মের ওপর পড়ে। এই 'জিন'-এর প্রভাব কমিউনিস্টদের মধ্যেও শুরু হয়ে গিয়েছিল। মার্কসবাদীরা ধর্মের প্রতি জন্মঘৃণা পোষণ করে থাকে। মার্কস আবার ধর্মকে 'জনতার আফিম' আখ্যা দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব প্রচলন করেন। কমিউনিস্টরা সর্বদাই ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আজন্ম বিরোধী প্রচারের ঢক্কানিনাদ চালিয়ে গেলেও ক্ষমতা হাসিল করতে মৌলবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করতে কমিউনিস্টদের জুড়ি নেই। এটা সাম্প্রদায়িকতারই অন্যতম উদাহরণ। আর ভারতীয় সমাজে বহু পূজিত প্রভু শ্রীরামের জয়গান করলেই সাম্প্রদায়িকতা হয়ে যায়। এটাই ছিল কমিউনিস্ট কালচার। কমিউনিস্টদের সংস্কৃতিটাই ছিল যে এই দলে যারা যত খুন করবেন তারাই তত সম্মান পাবেন। চৌত্রিশ বছর ধরে এটাই হয়ে এসেছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কণ্ঠকে স্তব্ধ করেছে। বলতে গেলে ৩৪ বছর ধরে কমিউনিস্টরাহু পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছিল। আসলে লেনিনবাদী কমিউনিজম একটা জনবিরোধী ফ্যাসিজম ছাড়া কিছুই না। পৃথিবীর ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করে। এ রাজ্যেও বামেদের ৩৪ বছরের ইতিহাসও কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট ইতিহাস হিসাবেই গণ্য হবে। বামেদের ঔদ্ধত্ব ও স্বৈরাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাই ক্রমশ কমিউনিস্টরা আদর্শচ্যুত হয়ে গেছেন। বামপন্থার নামাবলী গায়ে লাল ঝান্ডার আড়ালে তারা দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে ভূমিকা পালন করে গেছে। তাই আদর্শচ্যুত কমিউনিস্টদের মেকি বামপন্থী দল হিসেবেই চিহ্নিত করা উচিত হবে। একারণেই এ রাজ্যে আদর্শহীন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্যে সাধারণ মানুষ সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। রাজ্যের সরকার অধিকৃত স্কুল, হাসপাতাল, প্রশাসনিক স্তর সর্বত্রই কমিউনিস্ট বাস্তুঘুঘুর বাসা তৈরি হয়েছিল। ২০১১ সালে এমন অপদার্থ সরকারের পতন না হলে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন উঠত। নীতি আদর্শহীন কমিউনিস্টরা দীর্ঘদিন ভোটবাজিতে টিকে ছিল বাহুবলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে সাধারণ মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। একের পর এক ঘটনায় বামপন্থীদের জনবিরোধী চেহারা ক্রমশ যত উন্মোচিত হয়েছে ততই মানুষ তাদের বিপক্ষে চলে গেছে। তাই ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের আসন সংখ্যা নেমে আসে ৬২-তে। আর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ২৭টি আসন পেয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যের কোনো আসনেই জয়লাভ করেনি বামফ্রন্ট। উল্টে নির্বাচনে প্রতি কেন্দ্রে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে চলে গেছে। জাতীয় স্তরে তারা ২ শতাংশের চেয়ে কম ভোট পেয়েছে। এরাজ্য ছাড়াও ত্রিপুরাতেও জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হয়েছে। অর্থাৎ এদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে সি.পি.এম. তথা কমিউনিস্টরা ক্রমেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। বামপন্থী দলগুলো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নীতি আদর্শের পরিবর্তন ঘটাতে না পেরে নিজেদের অস্তিত্বকেই ক্রমশ বিপন্ন করে তুলছে। বামপন্থী মতাদর্শ অচল হয়ে পড়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল না মেলা, বাতিল হয়ে যাওয়া মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকার মূল্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে কমিউনিস্টরা। গোঁড়ামিই তাদের পতনের অন্যতম কারণ। যুক্তি, বুদ্ধি, সংস্কারমুক্ত সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে আগ্রহ দেখাননি তথাকথিত বাম নেতৃত্ব। তাই ক্ষমতা হাতছাড়া হতেই তাদের সংগঠন কর্পূরের মতো উধাও হয়ে গেছে। তাই এরাজ্য তথা সংসদীয় গণতন্ত্রে কমিউনিস্টরা আজ অবলুপ্তির পথে, প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

বাংলাদেশি মৌলবাদীরা পাকিস্তানপন্থী

সংবাদপত্রে প্রকাশ, কট্টরপন্থী ইসলামি দল ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ, তারা ভারতীয় হাই কমিশন অফিস ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য ভারতে নাকি মুসলমানরা জোর পূর্বক জয় শ্রীরামের শিকার হচ্ছে, মুসলমানদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যে নাকি অবাধে চলছে মুসলমান নির্যাতন। বায়তুল মোকারম মসজিদ থেকেই তারা এই কর্মসূচির অবস্থান নেয়। মসজিদে নামাজ পড়ার পরপরই ছুটছে হাই কমিশন অফিসে। তাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে মুসলমান মহিলারা নাকি এই নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আর জয় শ্রীরাম না বলার অপরাধে অনেককেই মৃত্যুকে বেছে নিতে হচ্ছে। এই ইসলামি দলটি সমাবেশ শেষে স্মারকলিপি নিয়ে জমা দিয়েছে। বেশ কয়েকদিন যাবৎ ইউটিউবের দারুণ দারুণ মেসেজ দেখতে পাচ্ছি। ভারতে নাকি দ্বিতীয়বার মোদী সরকার আসার পর পরই মুসলমানদের ওপর অকথ্য অত্যাচার বেড়েই চলেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশ রাজ্য থেকে মুসলমানরা দলে দলে অন্যত্র সরে পড়ছে। এই সরে পড়া ছাড়া এদের বাঁচার কোনো পন্থাই বের করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা খুবই চিন্তিত। কিন্তু তারা হিন্দু নির্যাতনের মতো ঘটনার কোনো কুফল খুঁজে পাচ্ছে না। তারা দেখতে পাচ্ছে শুধু মুসলমানরাই নিগৃহীত হচ্ছে এবং এটাই তাদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরা পাকিস্তানের মায়া কাটাতে পারছে না কি?

—স্বপন কুমার ভৌমিক,

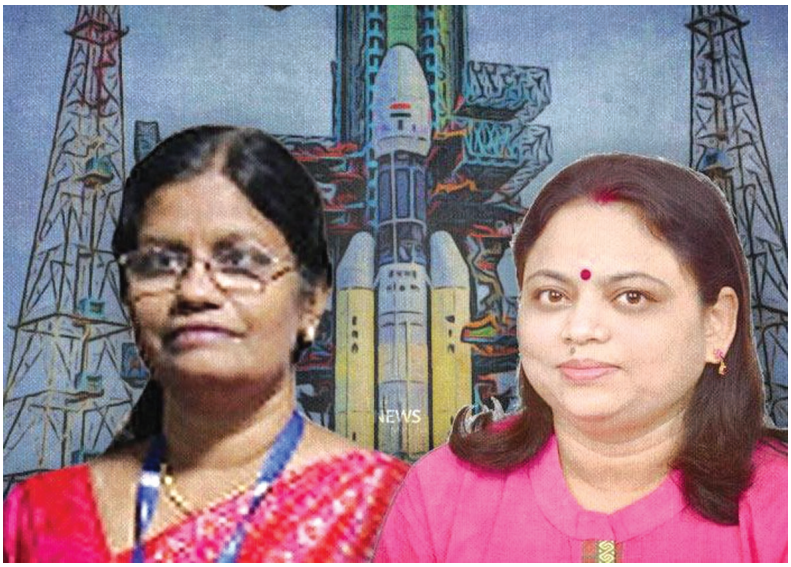
মহাকাশে নারীশক্তির জয়জয়কার

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

দশ, নয়, আট, সাত, ছয়... শূন্য এবং সৃষ্টি হলো ইতিহাস। গগনভেদী আওয়াজের সঙ্গে চন্দ্রযান-২ কে নিয়ে বাহুবলী রকেট জি এস এলবি-মার্ক ৩ উড়ে চলল নীল আকাশের দিকে। সম্পূর্ণ পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে ভারতের এই সফলতার সাক্ষী হলো। চন্দ্রযান-২ এর বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য হলো চাঁদের মাটিতে খনিজ এবং বরফের সন্ধান নেওয়া, মাটির উপরিভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের অধ্যয়ন করা ইত্যাদি।

চন্দ্রযান-২ চাঁদের কক্ষে স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস রচনা করবে ভারত। মোট ৪৮ দিন যাত্রার পরে চাঁদের মাটিতে পৌঁছবে। চাঁদে পৌঁছানো এবং এইসব প্রয়োগের জন্য চন্দ্রযান-২ এর তিনটি প্রধান অঙ্গ আছে; (ক) ২৩৭৯ কিলোগ্রাম ওজনের অরবিটার এক বছর পর্যন্ত চাঁদের পরিক্রমা করবে। এতে ৮টি পেলোড আছে। এই অরবিটার ব্যাঙ্গালুরুতে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ডিপ স্পেস নেটওয়ার্কের (আই ডি এম এন)-এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে। এছাড়া এটি ল্যান্ডারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে। (খ) ১,৪৭৯ কিলোগ্রাম ওজনের ল্যান্ডারের নাম ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানের জনক বিক্রম সারাভাইয়ের নামে রাখা হয়েছে। এতে তিনটি পে লোড আছে। এটি দু'মিটার প্রতি সেকেন্ড গতিতে চাঁদে নামবে। চাঁদে একদিন কাজ করার জন্য এটিকে বানানো হয়েছে। পৃথিবীর হিসাবে এটি ১৪ দিন পর্যন্ত কাজ করবে। এই ল্যান্ডারটি ব্যাঙ্গালুরুর আই কি এম এন-এর সঙ্গে সঙ্গে অরবিটার এবং রোভার-এর সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করবে। (গ) রোভার প্রজ্ঞান— এই নামটি সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ হলো জ্ঞান। ২৭ কিলোগ্রাম ওজনের এই রোভারে দুটি পেলোড লাগানো আছে। এটি ছ-চাকা যুক্ত একটি রোবাটিক বাহন, যা সৌরশক্তির সাহায্যে এক সেন্টিমিটার প্রতি সেকেন্ড



বাঁ দিকে মুথৈয়া বনিতা, ডানদিকে ঋতু করিধাল।

গতিতে চলতে পারবে। এটিও চাঁদে একদিন অর্থাৎ পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান কাজ করবে।

চন্দ্রযান-২-কে নিয়ে চাঁদের দিকে রওনা করার দায়িত্ব ইসরো বাহুবলীকে দিয়েছে। বাহুবলী ইসরোর সব থেকে শক্তিশালী রকেট। এর নাম জিয়েসিংক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল মার্ক-৩ (ডি এস এম এল ভি এম কে ও)। এটি চার টন ওজনের উপগ্রহ নিয়ে যেতে সক্ষম। এর ওজন হলো ৬৪০ টন এবং উচ্চতা ৪৩.৪৩ মিটার।

আমরা খুবই খুশি যে চন্দ্রযান-২-এর মাধ্যমে ভারত একটি নতুন অধ্যায় লিখতে চলেছে। বিশ্ব উৎসুক হয়ে ভারতের এই মিশনের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু সবথেকে আশ্চর্য এবং গৌরবের কথা হলো, এই অভিযানের মুখ্য দায়িত্বে আছেন আমাদের মাতৃশক্তি! এঁদের মধ্যে প্রমুখ হলেন ঋতু করিধাল শ্রীবাস্তব চন্দ্রযান-২-এর মিশন ডাইরেক্টর। সফল লঞ্চিং-এর পরে তাঁর শহর লক্ষ্ণৌয়ে উৎসবের মেজাজ পরিলক্ষিত হয়। ঋতুর বৌদি এবং বাড়ির অন্য সদস্যরা খুবই খুশি এই সাফল্যে। একই দৃশ্য দেখা যায়, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগে। এখানকার ড. পুনম ট্যান্ডনের মতে, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্রীর সাফল্যে গর্বিত।

চন্দ্রযান-২-এর প্রোজেক্ট ডাইরেক্টরের দায়িত্ব ইসরোর অপর মহিলা বৈজ্ঞানিক মুথৈয়া বনিতা প্রায় দু' দশক ধরে ইসরোতে কার্যরত। এই সময়ে বিভিন্ন গবেষণা এবং অনুসন্ধানের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জুড়ে আছেন। ২০০৬ সালে অ্যাস্ট্রোনটিকাল সোশ্যাইটি অব ইন্ডিয়ার পথ থেকে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা বৈজ্ঞানিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। চন্দ্রযান-২ এ তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশি।

এখানেই শেষ নয়। মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ আমাদের মাতৃশক্তি অনেক এগিয়ে। এঁরা হলেন টি কে অনুরাধা, এন বলারমধী বি আর নলিতাম্বিকা, সিথা সোমসুন্দরম, নন্দিনী হরিনাথ মিনল রোহিত, মৌমিতা দত্ত...। এঁদের মধ্যে আছে আমার প্রিয় ছাত্রী ইসরোর তরুণ বৈজ্ঞানিক অভিলাষা অগ্রওয়াল এবং আরও অনেকে। অপেক্ষা শুধু সুযোগের, যা আমরা আমাদের মেয়েদের দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ! ■



এনসেফেলাইটিস ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

এনসেফালাইটিস হলো মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের তীব্র প্রদাহ (অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন)। এই সমস্যা সাধারণত ভাইরাল সংক্রমণের ফলে হয়। অথবা শরীরের নিজের ইমিউন সিস্টেম ভুল করে মস্তিষ্কের টিস্যুকে আক্রমণ করে থাকে এবং প্রদাহের সৃষ্টি করে। তীব্র প্রদাহের অর্থ হলো রোগটি হঠাৎ করে আসে এবং রোগের তীব্রতা দ্রুত বাড়ে। এই জন্য এই রোগের জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

এই সংক্রমণটি সাধারণত প্রতি হাজার জনের মধ্যে একজনের ঘটে থাকে। সাধারণত এনসেফেলাইটিস জ্বর এবং সঙ্গে মাথাব্যথা দিয়ে শুরু হয়। উপসর্গগুলি দ্রুত খারাপ হতে থাকে। দেখা দেয় বমি, তরকা বিভ্রান্তি, তন্দ্রা এবং চেতনা হারানোর মতো লক্ষণ। এমনকী রোগী কোমায় পর্যন্ত চলে যেতে পারেন। এই রোগে আক্রান্ত অল্প বয়সের রোগী সাধারণত কোনও জটিল সমস্যা ছাড়াই সুস্থ হয়ে যান। কিন্তু বয়স্ক ও একদম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই সংক্রমণের জন্য বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়।

এনসেফেলাইটিসের নানান প্রকারভেদ রয়েছে। জাপানি এনসেফেলাই মশা দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। টিকা বোন এনসেফেলাটিস টিক (এঁটুজাতীয় পোকা) দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। আবার কোনও প্রাণীর কামড় বা আঁচড়ানোর রেবিস ভাইরাস দেহে প্রবেশ করেও এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও প্রাথমিক বা সেকেন্ডারি এনসেফেলাইটিস ভাইরাস, ফাঙ্গাস বা ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা মস্তিষ্কের সংক্রমণ হয়। আবার সেকেন্ডারি বা পোস্ট সংক্রামক এনসেফেলাইটিস-এর সৃষ্টি হয়, যখন ইমিউন সিস্টেম আগের সংক্রমণের প্রতিক্রিয়া জানায় এবং ভুলভাবে মস্তিষ্কের আক্রমণ করে। যদিও অধিকাংশ সময় এই প্রদাহ ভাইরাল সংক্রমণ দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু আরবো ভাইরাস অর্থাৎ ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস ও হারপিস ভাইরাসের কারণে এই সংক্রমণ হয়ে থাকে। এছাড়াও হাম, মামস, চিকেন পক্স, রুবেলা ও রেবিসও এই সংক্রমণের কারণে হয়। গ্রীষ্মকালেই এই সংক্রমণ বাড়ে। তবে এনসেফেলাইটিসের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে বয়স্ক ব্যক্তিদের ও এক বছরের কম বয়সি শিশুদের। এছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকা মানুষদেরও এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

রোগ নির্ণয় : রোগের লক্ষণ এবং রোগীর শারীরিক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে এই রোগ সন্দেহ করা হয়। রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রক্ত ও সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনে মস্তিষ্কের ইইজি বা ইমেজিং স্ট্যাডি এবং কখনও কখনও নির্দিষ্ট ভাইরাল স্ট্যাডিও করা হয় রোগের তীব্রতা নির্ণয়ের জন্য।

চিকিৎসা : এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় আমাদের চেষ্টা থাকবে যাতে উপসর্গগুলির আশু হ্রাস হয় যাতে রোগীর কোনও জটিলতা সৃষ্টি না হয়। এজন্য রোগীকে পুরোপুরি বিশ্রামে রাখা ও প্রচুর পরিমাণে জলপান করানো একান্তই প্রয়োজন। প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সেখানে অক্সিজেন ও ইন্ট্রা ভেনাস ড্রিপ দিতে হয় যাতে শরীরের ইলেক্ট্রো লাইটাস ব্যালেন্স ঠিক রাখা যায়।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনসেফেলাইটিস চিকিৎসার জন্য কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই রোগ প্রতিরোধের জন্য ভালো কাজ করে। এনসেফেলাইটিস সংক্রমণের চিকিৎসায় বেলেডোনা, জেলসিয়াম, হেলেবোরাস, হাইও সাইমাসনাইজার, স্ট্র্যামনিম। অ্যার্সেনিক অ্যালবাম, রাসটক্স, ব্র্যায়োনিয়া, আর্ণিকা, ইউপেটোরিয়াস ইত্যাদি ওষুধ বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে বেলেডোনা ওষুধটিই এনসেফেলাইটিসের চিকিৎসার জন্য শীর্ষস্থানীয়। তবে এই রোগের উপসর্গ, রোগের তীব্রতা, রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই ওষুধ নির্বাচন, ওষুধের শক্তি ও মাত্র ঠিক করা হয়ে থাকে।

এই রোগের প্রতিরোধী হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হিসাবে বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া কার্ব ও টিউবার কউলিমাস ২০০ মাত্রায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই রোগে সম্পূর্ণ আরোগ্য পেতে প্রায় বেশ কয়েক সপ্তাহ বা মাস লাগতে পারে।

প্রতিকার :

- যে সমস্ত সংক্রামক রোগের ফলে এনসেফেলাইটিস হয়। সেগুলি থেকে দূরে থাকা উচিত।
- মশারি ব্যবহার করা।
- বিভিন্ন রকম সংক্রামক রোগের টিকা শিশুদের দিতে হবে।
- এনসেফেলাইটিস আক্রান্ত থেকে দূরে রাখতে হবে।
- খাবারের আগে ভালো করে বারবার হাত ধোয়া প্রয়োজন।
- মশার কামড় এড়াতে ভোর ও সন্ধ্যায় বাইরে বের হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।
- ফুলহাতা জামা, লম্বা প্যান্ট, টুপি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- পোকামাকড় ও মশাবিতারক দ্রব্য বা রাসায়নিক ব্যবহার।
- বাড়িতে ও বাড়ির চারপাশে জল জমতে না দেওয়া।
- টিক বা এঁটুলি জাতীয় পোকার কামড় থেকে সাবধান থাকা।
- পোষ্যের নিয়মিত শরীর পরীক্ষা করা দরকার।

যোগাযোগ : ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩

মিশরে মাখন চোর

রবীন্দ্রনাথ দাস

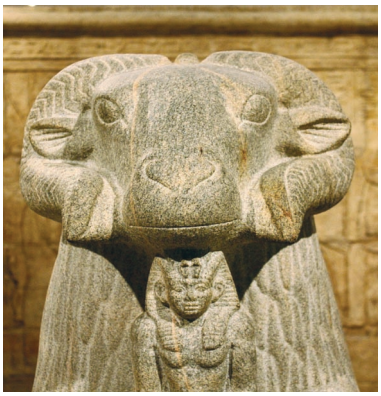
মিশর দেশে বড়ো এক শহর আছে, তার নাম 'কর্নক'। পুরাকালে সেখানে আমাদের মতোই ছিল রাজা-রানি, মন্দির, বিগ্রহ এবং পূজাপদ্ধতি। পৌরাণিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, মর্ত্যে গঙ্গার আবির্ভাব হয়েছিল মহাবিষ্ণুর পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে। ভাগবত পুরাণ থেকে জানা যায়, ভগবান বিষ্ণু বামন অবতারে মহাপরাক্রমী অসুর বলির অহংকার চূর্ণ করার জন্য তার রাজসভায় যান এবং 'তিনপদ' ভূমি ভিক্ষা করেন। শুধুমাত্র বাম পায়ে সারাবিশ্ব আবৃত করে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছাদকে বিদীর্ণ করে গঙ্গার আবির্ভাব ঘটান। সেইজন্য তার অন্য নাম হচ্ছে বিষ্ণুপদী। গঙ্গা তারপর ব্রহ্মলোকে চলে যান। ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যে নেমে আসার পূর্বে শিবের জটায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সারা জগতের সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু হচ্ছেন হিন্দুদের পরম আরাধ্য দেবতা। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আকাশ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, এমনকী তেত্রিশ প্রকার উপদেবতা অর্থাৎ রুদ্র, বাসু, আদিত্য, মারুত ইত্যাদিরও সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ম্ভু। 'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য' (গীতা : ১১/৩৮), ''বায়ুর্বমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ" (গীতা : ১১/৩৯)।

মিশর দেশেও আমাদের পৌরাণিক ইতিহাসের মতোই এক প্রচলিত উপকথা আছে 'কর্ণকের' প্রাচীন ইতিহাসে। তাদের সবথেকে বড়ো দেবতার নাম 'আমন' বা 'আমন-রা'। আর মিশরের সব থেকে বড়ো নদীর নাম হচ্ছে নাইল বা নীলনদ, যেমন আমাদের আছে পবিত্র নদী গঙ্গা। তাদের ধারণা পবিত্র নীলনদও বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা 'আমনরা'-র পায়ের আঙুল থেকে সৃষ্টি হয়েছে মিশরবাসীর কল্যাণের জন্য।

নীলের অর্থ হচ্ছে সর্বব্যাপী, গভীর, অসীম ও অনন্ত। আকাশের রং নীল। মহাসমুদ্রের বর্ণ নীল। মহাবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের রংও তাই সনাতন ধর্মে নীল দেখানো হয়েছে।

'আমনরা'-র গাত্রবর্ণ নীল, দ্বিভুজ অস্ত্রধারী মূর্তি এবং উষ্ণীষ শোভিত। আর মাথার ওই মুকুটে লাগানো আছে দুটি লম্বা পাখা। সবথেকে বড়ো ভারতের জাতীয় পাখি হচ্ছে ময়ূর। আর একমাত্র ময়ূরের পাখাই এত লম্বা হতে পারে। আমাদের প্রাণগোবিন্দ নীলাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ কলিযুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গাঢ়নীল হয়েছে এবং তাঁর মাথার মুকুটেও আছে দুটি ময়ূরপুচ্ছ। অদ্ভুত মিল!



অনুমান ভিত্তিক রচনা নয়, বরং নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক শিলালিপি এবং নথিপত্রের পর্যালোচনা করে সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে ভারত থেকেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি মিশর প্রদেশে এসেছিল যা পরবর্তী সময়ে 'আমনরা'র মূর্তিতে পূর্ণতা পেয়েছিল।

'আমনরা'-র মূর্তির সঙ্গে সর্বদাই থাকে একটি স্ত্রী মূর্তি, 'মুথ' আর একটি পুরুষ মূর্তি 'খন্সু'। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন ভগিনী এবং ভ্রাতা, আবার অন্য কেউ বলেন স্ত্রী ও পুত্রের মূর্তি। আমাদের পৌরাণিক উপকথাতে বর্ণিত হয়েছে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় রুক্মিণীর সঙ্গে প্রদ্যুম্নর উপাখ্যান। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ, সুভদ্রা ও বলরামের ত্রিমূর্তির চিত্র সারা বিশ্বের হিন্দুর কাছে অত্যন্ত পরিচিত।

আমরা সবাই ছোটোবেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি, প্রতিবছর বর্ষাকালে মিশরের নীল নদীতে বান আসে আর তা সমস্ত মিশরকে ভাসিয়ে দেয়। এটা নীলনদের অভিশাপ না আশীর্বাদ তা মিশরবাসীরাই জানেন। কিন্তু সেই বর্ষাঋতুতে আবহমানকাল থেকেই নাকি চলে আসছে 'আমনরা'র পূজা। কর্নক থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত লাক্সর আরও একটি শহর। থেবিয়ান প্রথা অনুযায়ী 'আমনরা'র সেই ত্রিমূর্তির, স্নান, অভিষেক, নতুন বস্ত্র পরিধান এবং তিনটি বৃহৎ আকারের সুসজ্জিত নৌকায় চাপিয়ে কর্নক থেকে লাক্সর ২ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করতো শোভাযাত্রা সহকারে। প্রতি বছর যা ছিল 'আমনরা'কে সাক্ষী রেখে রাজার রাজ্যাভিষেক।

সাবার আগে ফারাও অর্থাৎ সম্রাট ত্রিমূর্তির পূজা করতেন। তারপর প্রধান পুরোহিত-সহ অন্য ভক্তদের জাঁকজমক সহকারে, নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবতার পূজা করতে করতে লাক্সরের মন্দিরে পৌঁছানোর কথা বর্ণিত হয়েছে প্রাচীন মিশরীয় উপকথায়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন স্ফিংসের 'কলনাড' রাজমার্গ ধরে পায়ে হেঁটে, আবার অন্যরা বলেন তিনটি মাস্তুল সমন্বিত বিশালাকৃতি তিনটি জাহাজে ওই ত্রিমূর্তি বহন করে নদীপথে এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতো। এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী 'নুবিয়ান' সংগীতশিল্পী ও 'থেবিয়ান' নর্তকীদের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। নতুন বছরের সূচনা স্বরূপ বর্ষাঋতুর আগমনের সঙ্গে মিশরবাসীদের এই বার্ষিক উৎসবের নাম ছিল 'ওপেত'। প্রাচীনকালে 'কর্নক' ও 'লাক্সর' শহরে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হতো এই জাতীয় উৎসব। খ্রিস্টীয় ৬৪০ সালের পর অর্থাৎ মুসলমান খলিফার বিধ্বংসী আক্রমণ ও বিজয়ের পর যথারীতি সমৃদ্ধিশালী বাইজান্টাইন ও সেসানিড সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলোপ ঘটে অচিরেই।

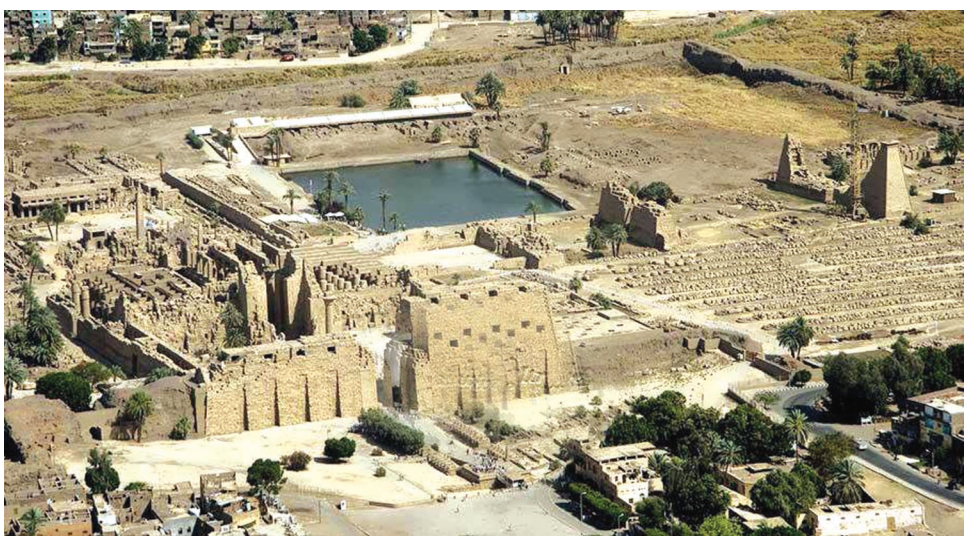
'লাক্সরে'র মন্দিরে পৌঁছানোর পর 'আমনরা'র হাত থেকে পবিত্র রাজদণ্ড গ্রহণ করে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে রাজ্য পরিচালনা করার দায়িত্ব ও অনুমতি নিতেন ফারাও। এটা শুধু রাজকীয় শাসন ব্যবস্থার নাটকীয় রূপই ছিল না, বরং ধার্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্যের বৈশিষ্ট্যও ছিল বিদ্যমান। বছরের শুরুতে বর্ষাঋতুর আগমন এবং আপামর মিশরবাসীর যোগদান, অর্থনৈতিক লেনদেন, সম্রাট, সৈনিক, পুরোহিত এবং প্রজার একত্র সহাবস্থান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহভাগী হওয়ার মধ্যে সামাজিক সমতার কথাই বেশি করে প্রকট হয়। বিশেষজ্ঞের মতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ওই সামাজিক উৎসবে মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রায় ১১,৩৪১টি খাদ্য মোড়ক ও পানীয়র ব্যবস্থা করতেন। বিশেষজ্ঞের মতে লাক্সারের রাজমার্গ ও মন্দির দুটিই নাকি তৈরি করেছিলেন রানি 'হাতসেপ্সুট।' 'আমনরা'র ত্রিমূর্তি লাক্সারে আগমন করলে, সেখানে রানি যথারীতি পূজা করতেন এবং ২৬ দিনের মাথায় 'কলনেডে'র রাজমার্গ ধরে সুসজ্জিত নৌকায় চড়ে অসংখ্য পুরোহিতের ঘাড়ে চেপে, সাধারণ মিশরবাসী আর সৈনিক পরিবৃত হয়ে, শোভাযাত্রার সঙ্গে আবার 'কর্নকের' মন্দিরে ফিরে আসতেন। স্মরণাতীতকাল ধরেই নাকি এই প্রথা চলে আসছিল মিশরের কর্নক শহরে।

মিশরের প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে খ্রিস্টপূর্ব ২০৫৫ থেকে ১৬৫০-এর মধ্যে দ্বাদশ রাজবংশীয় সম্রাট প্রথম সেনুস্রেথের সময় মিশরের প্রধান দেবতা ছিল 'আতুম'— যার নামে উৎসর্গিত হয়েছিল বিশাল এক মন্দির। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা স্তম্ভগুলির লিপিতে তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তী অষ্টাদশ রাজবংশীয় সম্রাট তৃতীয় আমেনহোটেপের সময় প্রথম 'আমনরা'র বিবরণ পাওয়া যায়। 'আমনরা'-ই ছিলেন আদি দেবতা যিনি অন্যান্য দেবতারও সৃষ্টিকর্তা বলে উল্লেখিত হয়েছেন। মিশরের 'কর্নকে'র সঙ্গে পুরীর কোণারকের হয়তো কোনো সম্বন্ধ থাকলেও থাকতে পারে যা বিশেষ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে প্রাচীনভারত বিষয়ক এক বিশিষ্ট গবেষক ও জার্মান ইতিহাসকার অধ্যাপক পিটার ভন বোলেনের কথায়, 'ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে প্রাচীন মিশরের সুগভীর সম্পর্ক ছিল, এটা প্রমাণিত সত্য'। পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-র অভিজ্ঞতা নেই এমন হিন্দুর সংখ্যা বিরল। মিশরের কর্নক মন্দিরের ওপেত উৎসব এবং পুরীর রথযাত্রার হুবহু মিলের কথা শুনে যে কোনো হিন্দুরই গর্ব বোধ হওয়ার কথা।

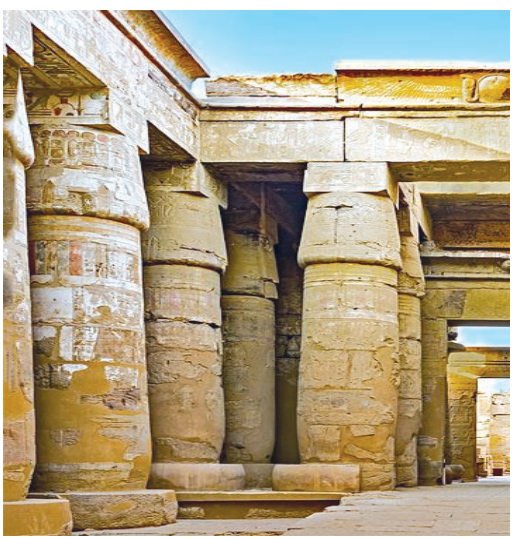
পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নারদপুরাণ, এমনকী রামায়ণেও বর্ণিত হয়েছে জগন্নিবাস জগন্নাথের পূর্জা-অর্চনার মধ্যে দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় ও মোক্ষপ্রাপ্তির কথা। অনাদিকাল থেকেই চলে আসছে বর্ষাঋতুতে পুরীর বার্ষিক জগন্নাথদেবের পূজা। মহাভারতের যুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবী ত্যাগ এবং কলিযুগের আরম্ভ থেকেই পুরীর জগন্নাথদেবের পূজার প্রচলন। জরা ব্যাধের তিরের আঘাত, মধ্যপ্রদেশ থেকে ওড়িশার সমুদ্র উপকূল ধরে জরা ব্যাধের শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান, নীলগিরি পাহাড়ের নির্জন বনের মধ্যে নীলমাধবের পূজা-অর্চনা, ওড়িশার রানি গুণ্ডিচার স্বপ্নাদেশ এবং নীলমাধবের খোঁজ, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে নিষাদরাজের যুদ্ধ, বিদ্যাপতির নীলমাধব উদ্ধার এবং পুরীর মন্দিরে তার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মপ্রাণ হিন্দু অবহিত আছি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, ভারত থেকে 'সিল্করুট' অথবা 'রেশমি-রাস্তা' ধরে আফ্রিকা, মধ্য-এশিয়া এমনকী প্রাচীন গ্রিস ও রোমের মাধ্যমে সারা ইউরোপে বিবিধ পণ্য সামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানি করা হতো। ভারতের মসলিন, হাতির দাঁত, সোনা, মণিমুক্তা, মশলা ও সুগন্ধীপণ্যের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল সারা বিশ্বে।

সমুদ্র পথেই যে প্রাচীন মিশরের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল তা ১৮৮১ সালে কলকাতাস্থিত থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির (আজকের কলেজ স্কোয়ারের পিছনের মহাবোধি সোসাইটি) জার্নালে কর্নেল হেনরি স্টিল ওয়ালকটের বর্ণনা থেকেও জানতে পারি। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, প্রাচীন মিশর ছিল যেন ভারতেরই অঙ্গীভূত একটি রাজ্য। মিশরের লোকেরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের দেশ হিসাবে ভারতেরই বর্ণনা করেছেন। তাদের আঁকা এবং খোদাই করা শিলাস্তম্ভগুলির চিত্রলিপিতে পাওয়া যায় রাজা 'প্রাহু' এবং রানি 'অতি'র নাম। তাদের নিখুঁত বর্ণনাতে আছে সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত বিশাল ভূভাগ এবং তার বিচিত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদকুলের অপূর্ব বর্ণনা যা ভারত ছাড়া আর অন্য কোনো দেশের সঙ্গেই মিল খায় না। সমুদ্রের ধারে মসলিন, সুগন্ধি, মশলা, হাতি, ময়ূর, নারকেল গাছের সারি— আর অন্য কোন দেশে পাওয়া যায়?

মুসলমান আক্রমণ ও বহুবার অত্যাচার সহ্য করেও কিন্তু জগন্নাথদেবের বার্ষিক অনুষ্ঠান আজও অব্যাহত আছে। পুরীর রথযাত্রা আর মিশরের ওপেত উৎসবের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আষাঢ়



লাকসর



কর্ণকের মন্দির

মাসের (জুলাই মাসের মাঝামাঝি) বর্ষাঋতুতে জগন্নাথের স্নান, অভিষেক, নতুন রথ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পাণ্ডা-পুরোহিত আর সারা বিশ্বের লক্ষাধিক ভক্তের সমাপম, ওড়িশার রাজা কর্তৃক সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা, পবিত্র গঙ্গাজল দিয়ে ত্রিমূর্তির স্নান, রথের রশি টানা এবং রানির প্রতিষ্ঠিত 'গুণ্ডিচা' মন্দির, যা কিনা ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, তার সামনে ৪০-৪৫ ফিটের বিশালাকৃতির তিনটি রথের আগমন— ওপেত উৎসবের তিনটি বিশাল নৌকার কথাই মনে করিয়ে দেয়। পুরীর রথযাত্রার সঙ্গে মিশরীয় 'ওপেত' উৎসবের মতো সাদৃশ্য পৃথিবীর আর অন্য কোনো দেশের কোনো উৎসবের সঙ্গে মিল খায় না।

বিখ্যাত গবেষক ডাঃ এডলফ এরমান লিখেছেন, প্রাচীনকালে, ২০০ বছর ধরে হিস্‌কস নামক বহিঃশত্রুর অত্যাচার থেকে মিশরবাসীদের রক্ষা করার জন্য মিশরের ধার্মিক দুই রাজা আহমেস ও কামেস, নীলগাত্র বর্ণ বিশিষ্ট, মাথায় সুদীর্ঘ পাখির পালক লাগানো উষ্ণীষধারী দেবতা আমনরার আশীর্বাদে বহিঃশত্রুর পরাজয় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এযেন শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে পাণ্ডবদের কৌরব বিজয়!

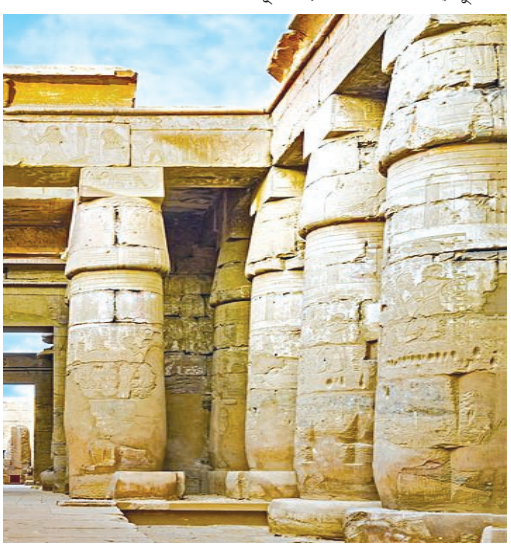
এটা ভাবা কি অলীক হবে যে ভারত থেকেই শত্রু দমনে মিশরের উদ্দেশে সেনাসহ ভারতীয় কোনো রাজা মিশরে গেছিলেন সমুদ্র পথে এবং হয়তো সেই সময়ই শ্রীকৃষ্ণকে মেনে নেওয়া হয়েছিল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলে? যদি ২৫০০ বছর আগে আলেকজান্ডার স্থলপথে হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারত আক্রমণ করতে পারেন তবে সমুদ্রপথে ভারতীয় কোনো বীর কেন মিশর পৌঁছাতে পারবেন না? ভারতীয় মশলা আর মসলিন যদি মিশরবাসীর প্রধান আকর্ষণ হতে পারে, তবে প্রাচীন মিশরে, বৈদিক দেব-দেবী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, সুভদ্রা আর বলরামের পূজা-অর্চনা হতে বাধা কোথায়? যদি সোনা, রুপা ও ও হাতির দাঁত পৌঁছাতে পারে তবে সেনাসহ ভারতীয় রাজারা সমুদ্রপথে মিশরে যেতে পারবেন না কেন?

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, প্রাচীন মিশরের লোকরা নিজেরাই বলত, তাদের পূর্বপুরুষরা নাকি ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে এসেছে যার নাম ছিল পোয়ানিত বা যার অপভ্রংশ হচ্ছে 'পুন্ত' বা 'পুণ্যভূমি'। ডাঃ এরমান লিখছেন, 'যা ছিল দেবতাদের বা পূর্বজদের বাসভূমি। লোহিত সাগর পেরিয়ে, সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমুদ্র ঘেরা বিশাল এক ভূভাগ, যেখানে আছে, দুই দাঁতওয়ালা হাতি, চিতা, বাঘ, লম্বা-লেজ বিশিষ্ট বানর, লম্বা-লেজওয়ালা বড়ো মাপের পাখি, নারকেল গাছের সারি, বিচিত্র সুগন্ধিযুক্ত গাছ এবং বহুমূল্য মণি-রত্নের সম্ভার'। 'দার-এল-বাব্‌রি'তে অবস্থিত 'রানি হাতসেপ্‌সুত'-এর মন্দিরের শিলাহস্তে খোদাই করা চিত্রলিপিগুলিতে লেখা আছে এই সেই পুণ্যভূমির কথা।

ওড়িশার রানি গুণ্ডিচার নীলমাধব, রাজস্থানের মেবার নিবাসী রানি মীরাবাঈয়ের নীলাম্বরধর গিরিধারী নাগর আর মিশরের রানি হাতসেপ্‌সুতের নীলবরণ আমনরা— সকলের মাথার উষ্ণীষে কিন্তু আছে ময়ূরের দুটি পালক বা শিখী-গুচ্ছ। মিশরের পাশেই আছে ইথিওপিয়া। ভারতীয়রা নাকি ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে, সেখানেই তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তারা এসেছিলেন সিন্ধু নদীর দেশ থেকে। একথার প্রমাণ পাওয়া যায় এউসেবিয়াস ও ফিলোস্ট্রটাসের নথি থেকে। তাছাড়া অধুনা লুপ্ত সপ্তম শতাব্দীর সেন্ট ইসিডোরের লেখা, এনসাইক্লোপিডিয়া অব নলেজে স্বীকার করেছেন, পুরাকালে ভারতীয়রা সিন্ধু নদীর পার থেকে এসেছিল মিশরে। তারা লোহিত সাগর ও নীলনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

একথার পুষ্টি সাধিত হয়েছে তাঁর পরবর্তী লেখক ও বিশিষ্ট প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা বিষয়ক গবেষক, আর্নল্ড আরমাল লাডউইগ হিরেনের বিশ্লেষণে। তার কাথায়, ''সিন্ধু নদীর তীরবর্তী ভারতীয় বৈশ্যরা আফ্রিকা ও মিশরে বাণিজ্য করতে এসেছিল এবং উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। হিন্দু রীতিনীতি ও ধার্মিক প্রথার প্রচলনও করেছিল''। প্রাচীন মিশরের উপর, লোরনা ওক এবং লুসিয়া গাহালিনের লেখা বই, 'এনসেন্ট ইজিপ্ট' বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এটা কোনো কল্পকাহিনি নয়। উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, পুরাকালে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তিন বা চার হাজার বছর সময়কালে, ইহুদি, খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামের জন্ম হয়নি, সেই সময় সম্ভবত ভারত উপমহাদেশ থেকেই সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল সভ্যতা আর সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় গৈরিক পতাকা। এটা কোনো অনুমান ভিত্তিক রচনা নয়, বরং নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক শিলালিপি এবং নথিপত্রের পর্যালোচনা করে সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে ভারত থেকেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি মিশর প্রদেশে এসেছিল যা পরবর্তী সময়ে 'আমনরা'র মূর্তিতে পূর্ণতা পেয়েছিল।

(লেখক বিশিষ্ট চিকিৎসক)





আমনরা-র নৌকোযাত্রা

মহাভারতের ছত্রপতি শ্রীকৃষ্ণ

দুর্গাপদ ঘোষ

ছত্রপতি কে? সাধারণ জ্ঞানে যিনি ছাতা ধরে থাকেন। কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনেক গভীর, তাৎপর্যপূর্ণ। গূঢ় অর্থে ছত্রপতি তিনি যাঁর ছত্রছায়ায় সবাই নিরুপদ্রবে, নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে অবস্থান করে। যাঁর অভয়মুদ্রা ছাতার মতো সবার মাথা আগলে রাখে। ছত্রপতি তিনি যাঁর আশ্বাস মানে প্রশ্নাতীত বিশ্বাস, যাঁর ছায়া মানে পরম নির্ভরতা। যাঁর ছত্রতল বিচ্যুত হওয়া মানে অধর্মে পতিত হওয়া, দুর্গতির রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। অধর্মকে আশ্রয় করা, বিনাশকে আলিঙ্গন করা। মহাভারতে এরকম পুরুষ হলেন মহাবৃষ্ণি বাসুদেব। ভূ-ভারতে মহাতেজ, মহাশক্তি, মহাপরাক্রম এবং মহামেধায় যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। 'মহাভারত' নামে এক মহাকাব্যের আঙ্গিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব ভারত নামের এক রাষ্ট্রীয় ধারণা (concept) দিয়ে গেছেন। কৃষ্ণচরিত্র অনুসরণ করলে বুঝতে পারা যায় সেই রাষ্ট্রচেতনার আদি রূপকার তিনিই। রাষ্ট্র যদি জাতিসত্তার (nation) দ্যোতক হয় তবে মহাভারতে কৃষ্ণই রাষ্ট্র। মহাকাব্যের মোড়কে মহাভারত এমন এক ছায়াছত্র, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অনিবার্য মন্থনে যে ছত্রতলে এসে মেশে অসংখ্য খণ্ডরাজ্য। ঐহিক দৃষ্টিতে সেই বৃহৎ ছত্র পাণ্ডবেরা। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তার ভরকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ। গূঢ় অর্থে তিনিই রাষ্ট্র, তিনিই মহাভারত।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল এমন ধারণা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু এই মহাযুদ্ধ এবং তাঁর আগে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ যে এক অখণ্ড রাষ্ট্রচেতনার রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তার মূলকেন্দ্র যে কৃষ্ণ এবং তিনিই যে সর্বকালের সর্বোত্তম পুরুষ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাপারে কৃষ্ণের নিজেরই আত্মবিশ্বাস কতখানি দৃঢ় ছিল তার প্রমাণ পাই শ্রীমদ্ভগবত গীতায়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে তিনি অর্জুনকে বলছেন, 'নরাণাঞ্চ নরাধিপম্'— নরগণের মধ্যে আমিই নরাধিপ। এখানে আমিত্বের অহং অন্বেষণ করতে যাওয়া বৃথা। বারান্তরে এমন কথা তিনি আরও অনেকবার বলেছেন। অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ পর্যন্ত দর্শন করিয়েছেন। এহেন কৃষ্ণ যে কেবল নর বা মানুষ ছিলেন এইটুকুই নয়। তিনি ছিলেন গোলোকাধীশ বিষ্ণুর নরাবতার। তাই তাঁর মধ্যে মনুষ্য প্রকৃতির



সঙ্গে সঙ্গে ছিল অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরিক গুণাবলীও। মর্ত্যধামে দুষ্কৃতী বিনাশ করে ন্যায় ও ধর্মের অনুসারীদের পরিত্রাণের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার জন্যই অবতাররূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। ধর্মভ্রষ্ট, দুরাচারীদের কবল থেকে ভারতভূমিকে কলুষমুক্ত করে ধর্ম তথা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে সুদর্শন চক্রের মতো অমোঘ অস্ত্রেরও যে প্রয়োজন হতে পারে তার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। প্রজারঞ্জক রাজার (তৎকালীন সময়ের প্রথা) মধ্যে দিয়েই যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, এরকম রাজারাই যে ভগবানের বিভূতিস্বরূপ, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে পার্থসারথিরূপে উপস্থিত থেকে অর্জুনকে সেকথা ব্যাখ্যা করেছেন। আর এরকম রাজার রাজা ছিলেন তিনি নিজে।

কৃষ্ণের অনুমান শক্তি, সর্বজ্ঞতা ছিল তুলনাহীন। বারণাবতের জতুগৃহ থেকে গুপ্তপথে পালিয়ে মাতা কুন্তীসহ পাণ্ডবরা তপস্বীর বেশে কীচক দেশের মধ্যে দিয়ে একচক্রা পৌঁছন। সেখানকার অধিপতি নরাধম বক-কে হত্যা করেন। তারপর সোমাশ্রয়ণে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজিত করে পৌঁছন পাঞ্চাল রাজ্যে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাস্থলে। কুন্তীকে আশ্রয় দিলেন এক কুম্ভকার। স্বয়ম্বরের লক্ষ্যভেদে পাঞ্চালীকে জয় করে পঞ্চপাণ্ডব যখন কুন্তীর কাছে নিয়ে এলেন তখন বলরামকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে প্রায় ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেন কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির বিস্ময়াভিভূত হয়ে জানতে চাইলেন ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের তিনি চিনলেন কীভাবে? কৃষ্ণ তাঁর চিরপরিচিত স্মিত হাসিতে জবাব দিলেন, 'আগুন ছাইচাপা থাকলেও তার তাপ ও তেজ অনুভব করা যায়। মহারথীদের মধ্যে থেকে পাঞ্চালীকে জয় করে নেবার সামর্থ্য আর কাদের থাকতে পারে?' আগুনের শক্তি চেনার এই যে অতীন্দ্রিয় মেধা, ঈশ্বরাবতার পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ব্যতিরেকে মনুষ্যকুলে বিরল। পাণ্ডবরা আগুন কিন্তু আপাতত তাঁরা অজ্ঞাতবাসেই থাকুন, তাতে তাঁদের ভালোই হবে এই পরামর্শ দিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম বিদায় নিলেন। ওই পরামর্শের মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণ সেদিন ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন পাণ্ডবরা তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তার ওপর তাঁদের অগাধ ভরসা ছিল। তাঁদের মাথার ওপর বাসুদেবের ছত্রছায়া আছে এই আস্থায় দ্রৌপদী জয়ের বলবীর্যে বলিয়ান প্রমাণিত হয়েও পাণ্ডবরা তাঁর পরামর্শ মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলেন। সুফল পেলেন তাঁর কিছুদিন পরেই। তপস্বীবেশী পঞ্চপুরুষ যে পঞ্চপাণ্ডব, স্বয়ম্বর ঘটনার পর থেকেই সর্বত্র কানাঘুষা চলছিল। তাঁদের শক্তি-সামর্থ্যের আলোচনা চলছিল মুখে মুখে। এর সুযোগ গ্রহণ করতে দেরি করলেন না কৃষ্ণ। তাঁর



পরামর্শে পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দৃপ্তভঙ্গিতে রাজত্বের দাবি করলেন। পাণ্ডবদের সেই দৃপ্ততার মুখে নরম হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে সামনে রেখে কৌরবপতি তাঁদের অর্ধেক রাজত্ব দিতে রাজি হলেন। তবে এমন জায়গা ছাড়লেন যা সভ্য মানুষের বসবাসের অযোগ্য। সেটা হলো খাণ্ডবপ্রস্থ। এলাকাটা জঙ্গলাকীর্ণ এবং সর্প ও দানব সঙ্কুল। এবারও পাণ্ডবদের মাথায় অভয়ছত্র ধরে কৃষ্ণ বললেন, চিন্তা করো না, হতাশ হয়ো না। অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে সেই বন দহন করে জনপদ গড়ে তোলার উপযুক্ত করে দিলেন। কৃষ্ণের কথামতো স্থাপত্যবিদ ময় নির্মাণ করে দিলেন এক সুরম্য ও অতুলনীয় নগর-রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ। যার রাজপ্রাসাদে খচিত হলো মৈনাক পর্বত থেকে নিয়ে আসা মণিরত্ন।

জ্যেষ্ঠপাণ্ডব যুধিষ্ঠির সিংহাসনারূঢ় হওয়ার কিছুদিন পরেই দেবর্ষি নারদ এসে তাঁকে রাজসূয় যজ্ঞ করে শ্রেষ্ঠ নৃপতির শিরোপা লাভ করতে বললেন। সেই সঙ্গে রাজধর্ম সম্পর্কে দিয়ে গেলেন নানা মূল্যবান উপদেশ। কালক্ষেপ না করে কৃষ্ণকে দ্বারকা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনানো হলো। নারদের পরামর্শ নিয়ে কী করা যায় তা নিয়ে হলো মন্ত্রণা। কৃষ্ণ বললেন, 'এমনিতে সব ঠিক আছে কিন্তু সমস্যা জরাসন্ধকে নিয়ে। মগধের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা এখনো বর্তমান। তাঁর ভয়ে সবাই তটস্থ। ভগদত্ত, সুর, মেঘবাহন, করভ, বক্র প্রমুখ প্রায় সব রাজাই তাঁর অনুগত। বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতের রাজা পৌণ্ড্রক এবং ভোজরাজা ভীষ্মক-এর মতো শক্তিশালী রাজারা পর্যন্ত জরাসন্ধকে শ্রেষ্ঠ ও সম্রাট বলে মানেন। আমাদের পক্ষে বস্তুত পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশের রাজা পুরুজিৎ ছাড়া কেউ নেই।' এখানে কৃষ্ণের রাজনীতি তথা কূটনৈতিক প্রজ্ঞার একটা দিক আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। বেশ কিছু বছর আগে মথুরার অধিপতি দুরাচারী কংসকে তাঁর রাজসভার মধ্যেই নিধন করেছিলেন কৃষ্ণ। শূরসেন সাম্রাজ্যের অধিপতি কংস ছিলেন যাদব, অন্ধক, বৃষ্ণি এবং ভোজদেরও রাজা। তাঁকে হত্যা করে তাঁর সিংহাসনে কংসের পিতা উগ্রসেনকে উপবেশন করালেও এইসব রাজা প্রকৃতপক্ষে চলে এসেছিল কৃষ্ণেরই নিয়ন্ত্রণে। উগ্রসেন ছিলেন নিমিত্তমাত্র।

কংস ছিলেন জরাসন্ধের জামাই। তাঁর দুই স্ত্রী অস্তি ও প্রাপ্তির পিতা জরাসন্ধ জামাতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে অনবরত মথুরায় আক্রমণ শানিয়ে যেতে থাকেন। তবে প্রত্যেকবারই কৃষ্ণ-বলরামের কাছে প্রতিহত হতে হয়। টানা সতেরোবার জরাসন্ধের আক্রমণ প্রতিহত করার পর কৃষ্ণ বুঝলেন এভাবে যাদবদের মথুরায় শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব হবে না। তাই আঠারোবারের আক্রমণের আগে দ্বারকার সমুদ্রে এক দ্বীপখণ্ডে নগর পত্তন করে মথুরা থেকে যাদবদের সেখানে নিয়ে চলে যান। কিন্তু মগধরাজের ওই প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং বারংবার মথুরা আক্রমণে ভিটেছাড়া হতে বাধ্য হওয়া কৃষ্ণের মনে জরাসন্ধ নিধনের পরিকল্পনা দানা বেঁধেই ছিল। সেজন্য এক এক করে জরাসন্ধের অনুগত রাজাদের ইহজগৎ থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হত্যা করেছিলেন কালযবন, হংস ও ডিম্বককে। কিন্তু আরও অনেক খণ্ডরাজ্যের অধিপতিরা ছিলেন জরাসন্ধের অনুগত। এছাড়া মগধরাজের নিজেরই একুশ অক্ষৌহিণী সেনার সুবিশাল বাহিনী ছিল। তাদের প্রতিহত না করে জরাসন্ধের সামনাসামনি হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই তাঁকে বিনাশ করতে হলে যে পাণ্ডবদের মতো মহাবীরদের প্রয়োজন এবং তাঁকে যে কৌশলে হত্যা করা ছাড়া ভিন্ন পথ নেই এটা কৃষ্ণ খুব ভালোই জানতেন। অথচ ধর্মরাজ হিসেবে খ্যাতিমান যুধিষ্ঠিরকে সেপথে নামানো যে খুব সহজ নয় তাও তাঁর অজানা ছিল না। তাই তাঁর রাজচক্রবর্তী সম্রাট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা উস্কে দিয়ে বললেন, 'জরাসন্ধের ভয়ে এক সময় আমি নিজে রৈবতক পর্বতের এক দুর্গম স্থানে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন অন্ধক আর বৃষ্ণিরা আমার সঙ্গে আছেন, আছেন আঠেরো হাজার আত্মীয় পরিজন। আর আপনারা তো আছেনই। জরাসন্ধকে সরাতে না পারলে আপনার রাজসূয় যজ্ঞ সম্ভব হবে না। একে তিনি নিজে প্রভূত বলশালী। তার ওপর তাঁর অধীনে রয়েছেন ছিয়াশিজন অনুগত রাজা। কেবলমাত্র চোদ্দজন তাঁর অনুগত নন। এমতাবস্থায় জরাসন্ধকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত ও নিধন করা অসম্ভব।' শুনে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ করতে চাইলেন। কৃষ্ণ এটাই চাইছিলেন। এবার তাঁকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বললেন, সেকি মহারাজ! স্বয়ং দেবর্ষি আপনাকে তা করতে বলেছেন। এতে স্বয়ং দেবতাদেরও আশীর্বাদ আছে জানবেন। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। জরাসন্ধকে আমরা গুপ্ত উপায়ে সরিয়ে দেব। যুধিষ্ঠির কোনো কথা না বলে মৌন রইলেন। আর এভাবে তাঁর সম্মতি আদায় করে নিলেন কৃষ্ণ। এর পরের ঘটনা, কৃষ্ণ ভীমকে দিয়ে গুপ্তপথ তৈরি করিয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জরাসন্ধের সামনে উপস্থিত হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং কৌশল অবলম্বন করে ভীমকে দিয়ে তাকে বধ করালেন। জরাসন্ধের মতো পরাক্রমীর এহেন পরিণতিতে তাঁর পুত্রসহ ছিয়াশিজন রাজা যুধিষ্ঠিরের অধীনতা মেনে নিতে স্বীকৃত হলেন। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের রাজসূয় যজ্ঞের পথে আর কোনো বড়ো প্রতিবন্ধকতা রইল না। জরাসন্ধ নিধনে প্রায় নিষ্কণ্টক কৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবরা নির্গত হলেন দিগ্বিজয়ে। কে কোনদিকে যাবেন, বিভিন্ন রাজাদের শক্তি-সামর্থ্যের তুল্যমূল্য বিচার করে সেটাও ঠিক করে দিলেন কৃষ্ণ। তাঁর পরামর্শ শিরোধার্য করে অর্জুন উত্তরে কাশ্মীর, লোহিতদেশ, ত্রিগর্ত, সিংহপুর, হরিবর্ষ, গন্ধর্ব, কম্বোজ, কুলিন্দ, আনর্ত, শাকলদ্বীপ ইত্যাদি জয় করে গেলেন উত্তর-পূর্বের প্রাগজ্যোতিষপুরে। পরে কৃষ্ণ নিজে কামরূপের রাজা নরকাসুরকে বধ করে ষোলো হাজার রমণীকে উদ্ধার করেন। পরাজিত করেন শোণিতপুরের রাজা বাণকেও। এইভাবে উত্তর এবং পূর্বোত্তর ভারতকে বস্তুত এক ছাতার তলায় নিয়ে আসেন কৃষ্ণ। মধ্যম পাণ্ডব ভীম পাঞ্চাল, বিদেহ, চেদি, অযোধ্যা, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি জয় করেন। মৎস্য, অবন্তি, ভোজকট, কিস্কিন্ধ্যা, মহীষ্মতি, দ্রাবিড়, কেরল, লঙ্কা, অন্ধ্র ও কলিঙ্গ রাজাদের পরাস্ত করেন সহদেব। আর নকুল জয় করেন মালব, মদ্র, দ্বারকার মূল ভূখণ্ডের নরপতিদের (শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরী ছিল মূল ভূ-খণ্ড থেকে যোজন খানেক দূরে সমুদ্রবেষ্টিত একটি দ্বীপে)। অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সমগ্র ভারতবর্ষের খণ্ডরাজ্যগুলোকে এক ছত্রতলে নিয়ে এসে এক সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রের রূপকার হন কৃষ্ণ।

শুরু হলো যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ। সমস্ত রাজা এমনকী কৌরবরাও এসে উপস্থিত হলেন। সম্মিলিত হলো গোটা ভারত। আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যমণি যুধিষ্ঠির। কিন্তু প্রকৃত ছত্রপতি কে তা নিশ্চিত করতে ভুল করলেন না জ্ঞানবৃদ্ধ ভীষ্ম। সম্মিলিত মহাভারতের এই মহাযজ্ঞে কে ভূষিত হবেন পুরুষোত্তম? সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের স্বীকৃতি লাভ করবেন কে? পিতামহ জানেন যুধিষ্ঠিরের রাজচক্রবর্তী হওয়ার পিছনে আসল মস্তিষ্ক, প্রধান কারিগর কৃষ্ণ। তাঁর ছত্রছায়া ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। তাই এতটুকু দ্বিধা না করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন— তেজ, বল, পরাক্রম ও দূরদর্শিতায় ব্রিষ্ণিকুলসম্ভব বাসুদেবেই শ্রেষ্ঠ। তাঁকেই তুমি অর্ঘ্য সম্প্রদান কর। সেইমতো কৃষ্ণকে যজ্ঞার্ঘ্য নিবেদন করলেন সহদেব। অর্থাৎ রাজার রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো কৃষ্ণকে। কিন্তু কৃষ্ণের এই মর্যাদা বরদাস্ত না করতে পেরে বিরুদ্ধাচরণ করলেন চেদিরাজ শিশুপাল। তিনি এর আগে নিরানব্বইবার কৃষ্ণকে নিন্দামন্দ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বয়োবৃদ্ধ হিসাবে বসুদেব এই সম্মান পেতে পারেন কিন্তু বাসুদেব নন। পেতে পারেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ,

আচার্য হিসেবে অস্ত্রগুরু দ্রোণ। পুরোহিত হিসেবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব কিংবা পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকেও এই সম্মান প্রদান করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে দুর্যোধনকে 'রাজেন্দ্র' অভিহিত করে তাঁর নাম করতেও দ্বিধা করলেন না। শিশুপালের এই মতিভ্রম দেখে ভীষ্ম তাঁকে নিরস্ত করা এবং সেইসঙ্গে সবাইকে শুনিয়ে বললেন,

'অস্যাং হি সমিতৌ রাজ্ঞামেকমপ্যজিতং যুধি।
ন পশ্যামি মহীপালং সাত্বতীপুত্রতেজসা।।'

এই সভায় আমি তো কৃষ্ণের চাইতে অধিক তেজ ও পরাক্রমী কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এখানে এমন একজন রাজাকেও দেখছি না যিনি কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হননি। কৃষ্ণের দৈহিক শক্তির অনন্যসাধারণ বর্ণনা ছাড়াও পারমার্থিক দিক নিয়েও পর্যালোচনা করলেন ভীষ্ম এবং তাঁকে স্বয়ং 'ঋষিকেশ' বলে অভিহিত করলেন। বললেন, কৃষ্ণের পূজাতেই সকলের পূজা সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণই হলেন ভারতাত্মার সনাতন পরামাত্মা। অতঃপর সুদর্শন চক্রে শিশুপালের মুণ্ডচ্ছেদের বর্ণনার কথা সর্ববিদিত।

কৃষ্ণের রাজনীতির গভীরতা বুঝতে হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং তার পেক্ষাপট একান্তভাবে প্রতিপাদ্য। শকুনির চালে দ্যূত ক্রীড়ার নামে জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে বনবাসে যেতে হয় পাণ্ডবদের। কৃষ্ণ সেসময় শাল্বনগরের রাজা শৌভের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন। নাহলে তিনি হয়তো শকুনির চাল থেকে যুধিষ্ঠিরকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু তখন পাণ্ডবদের মাথার ওপর থেকে সেই ছাতাটা খানিকটা দূরে থাকার জন্য পাণ্ডবদের এই লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। চোদ্দ বছরের বনবাস এবং এক বছরের অজ্ঞাতবাস শেষ হতে না হতেই কীভাবে হস্তিনাপুর দখল করা যায় তা নিয়ে মন্ত্রণা শুরু হলো বিরাট রাজার সভায়। কৃষ্ণ প্রস্তাব দিলেন অর্ধেক রাজত্বের দাবি নিয়ে হস্তিনাপুরে দূত পাঠানো হোক। তাঁর কথামতো বিরাট রাজার পুরোহিতকে দূত হিসেবে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠানো হলো। কিন্তু সেই সঙ্গে বাসুদেব ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সম্মুখ সমরের প্রয়োজন হতে পারে ইঙ্গিত দিয়ে পাণ্ডবদের যুদ্ধেরও প্রস্তুতি নিতে বললেন। বিরাট রাজার পুরোহিত প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এলেন। তবুও কিন্তু নিজেদের থেকে আক্রমণের রাস্তায় না গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে অধিকার আদায়ের একটা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা করলেন যাতে অন্যান্যরা দুর্যোধনের দম্ভের পরিচয় আরও স্পষ্টভাবে লাভ করতে পারেন। সেই আলোচনায় দৌত্যের ভার নিলেন নিজের কাঁধে এবং উপপ্লব্য থেকে হস্তিনাপুরে গেলেন। এর ঠিক আগের দিন একটা ঘটনা ঘটে। উপপ্লব্যে কৃষ্ণ এবং অর্জুন যুদ্ধায়োজনের বিষয়ে আলোচনা করছেন এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন সঞ্জয়। পাণ্ডবদের দূত হিসেবে কৃষ্ণের বক্তব্যকে কৌরবরা যাতে উপযুক্ত গুরুত্ব দেন সেজন্য সঞ্জয়কে কৃষ্ণ বললেন, ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়ে বলো প্রিয়জনদের সঙ্গে কয়েকটা দিন আনন্দ করে নিতে। তিনি যদি মনে করে থাকেন অর্জুনের মতো মহারথীকে পরাজিত করবেন তাহলে সেটা হবে তাঁর দুরাশা। এরকম আশা করা মানে ধৃতরাষ্ট্র কালগ্রাসে পতিত হয়েছেন। এটা কূটনীতির চতুরঙ্গের এক রঙ্গ— দম বা দমননীতি মানে হুঁশিয়ারি দেওয়া। কৃষ্ণের এটা জানাই ছিল যে ধৃতরাষ্ট্র চাইলেও দুর্যোধনকে তিনি বশে আনতে পারবেন না। সেকারণেই পাণ্ডবদের অনেক আগে থাকতেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন।

মহাভারতের উদ্যোগ এবং শল্য উভয় পর্ব থেকেই জানা যায় যে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরেই উপপ্লব্য থেকে যাত্রা করে পথিমধ্যে ব্রকস্থলে একদিন বিশ্রাম করেন কৃষ্ণ। পরদিন হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিতে বলেন। বেঁকে বসেন দুর্যোধন। চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে জানিয়ে দেন কৃষ্ণের এই প্রস্তাব মানতে তাঁরা রাজি নন। অনেক টালবাহানার পর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে বারণাবত, কুশস্থল, অবিস্থল, ব্রকস্থল এবং মাকণ্ডী— এই পাঁচখানা গ্রাম ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন কৃষ্ণ। কিন্তু দুর্যোধন সে প্রস্তাবও নস্যাৎ করে সুঁচের ডগায় যেটুকু মাটি ওঠে পাণ্ডবদের সেটুকুও দেবেন না বলে দর্প প্রকাশ করেন। কৃষ্ণের সঙ্গে অভব্য আচরণও করা হয়। সেকারণে বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ দুর্যোধনের আতিথেয়তা গ্রহণ না করে চলে যান বিদুরের গৃহে। হস্তিনাপুর থেকে তিনি যখন ফের উপপ্লব্যের পথে রওনা দেন তখন কর্ণও তাঁর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত আসেন। পথে কৃষ্ণ তাঁকে বলেন, এখন আর যুদ্ধ ছাড়া অন্য পথ রইল না। অতএব, কর্ণ যেন দুর্যোধনকে সেজন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।

ফিরে এসে পাণ্ডবদের সবকথা জানিয়ে কৃষ্ণ বলেন, সাম, দম, দণ্ড, ভেদ— সব নীতিই প্রয়োগ করেছি কিন্তু যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব নয়। আরও বলেন, আমরা সংখ্যায় কম হলেও কাপুরুষ নই, ক্লীব নই। ক্ষত্রিয় বীরের কাছে যুদ্ধে মৃত্যু মানে বীরগতি লাভ করা। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে যুদ্ধের ঠিক প্রাক্‌কালে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকেও ঠিক এভাবেই উজ্জীবিত করে। বলেছিলেন—

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপদ্যতে।
ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।'

ক্ষত্রিয়ের ক্লীবতাকে নপুংশকতা বলে কটাক্ষ করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে কৃষ্ণ নিজে যুদ্ধ করেননি। ছিলেন অর্জুনের সারথি। কিন্তু অযুধ্যমান থেকেও তিনিই ছিলেন প্রকৃত নিয়ন্তা। তাঁর কৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, জয়দ্রথ প্রমুখ এমনকী দুর্যোধনসহ কৌরব পক্ষের যাবতীয় শূরবীরেরা একে একে ধরাশায়ী হন। একচ্ছত্র সম্রাট হন যুধিষ্ঠির। মহাভারতের সাধারণ জ্ঞান রাখা কোনো মানুষের কাছে এসব কথা বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন নেই। যেকথা পুনরায় উচ্চারণ না করলে নয় তাহলো, ওই মহাযুদ্ধের পর সারা ভারত কৃষ্ণের ছত্রছায়ায় চলে আসে। অবন্তী, মৎস্য, অটবী, বহুধান্য, উত্তরজ্যোতিষ, ত্রিপুরা, আভির, চক্র, মিথিলা, বিদেহ, ভোজ, ইত্যাদি সমস্ত খণ্ডরাজ্য যুদ্ধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করে।

এই সাফল্যের প্রতিভূ রূপে পাণ্ডবরা থাকলেও সমস্ত রাজারাই 'রাজার রাজা' বলে মেনে নেন দ্বারকাধীশকে। যুধিষ্ঠির একছত্র সম্রাট হলেও সেই ছত্রের প্রধানাধিপতি আর কেউ নন, তিনি ভগবানের বিভূতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই মহাভারতের ছত্রপতি।





কলকাতায় বিদ্যার্থী বিকাশের উদ্যোগে আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি স্তরে রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের 'বিদ্যার্থী বিকাশ' আয়ামের উদ্যোগে 'জিজ্ঞাসা'র



পরিচালনায় কলকাতার সল্টলেকের ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব হোমিওপ্যাথি পরিসরে গত ২৭-২৮ জুলাই 'ট্রাডিশনাল মেডিসিন' বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ৫০ জন চিকিৎসক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন, মা সরস্বতী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের উপদেষ্টা বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ কে এস সেঠী। প্রধান অতিথি রূপে নয়া দিল্লির সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ান মেডিসিনের চেয়ারম্যান বৈদ্য জয়ন্ত দেবপূজারি, প্রধান বক্তারূপে তিরুবনন্তপুরমের জওহরলাল নেহরু ট্রপিক্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের সিনিয়র সাইনটিস্ট বৈদ্য বিনোদ কুমার টি জি, বিদ্যার্থী বিকাশ ট্রাস্টের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি গৌরচন্দ্র গরাই, বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সভাপতি ড. সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, এনআই এইচের ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসার জাতীয় আহ্বায়ক ডাঃ বিনীত মোহন, জিজ্ঞাসার পশ্চিমবঙ্গ শাখার আহ্বায়ক বৈদ্য নুপুর বিশ্বাস প্রমুখ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনআইএইচ-এর ফিজিয়োলজি বিভাগের সহ অধ্যাপক ডাঃ শিশির কুমার সিংহ। প্যানেল বৈঠকে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের নীতি নির্ধারকদের আয়ুষ বিভাগের পুনর্গঠন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাতে পুনর্সংস্কার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবায় হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার অবদান নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীদেবপূজারি।

দ্বিতীয় দিনে ছ'টি অলাদা আলাদা অধিবেশনে 'ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট থ্রু আয়ুর্বেদা' বিষয়ে গোয়ালিয়রের আয়ুর্বেদ ও পঞ্চকর্ম চিকিৎসালয়ের ডাঃ অনুজ জৈন, 'অভঙ্গ' বিষয়ে কর্মশালা জেবি রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চকর্ম বিভাগের ডাঃ পুলক কান্তি কর, 'হোমিওপ্যাথিক ম্যানজমেন্ট অব ইনফার্টিলিটি' বিষয়ে কর্ণাটকা বোর্ড অব হোমিওপ্যাথক সিস্টেম-এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ বিটি রুদ্রেশ, 'মডার্ন হামিয়োপ্যাথিক ট্রিটমেন্টস্' বিষয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথিক'-র ডিরক্টর ইন চার্জ ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, 'অ্যান আউটলুক অন কেরলীয় চিকিৎসা কর্ম' বিষয়ে আলোচনা করেন কেরলের পঙ্কজ কস্তুরী আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ রজনী এ নায়ার।

সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্ব ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক সুনীল আম্বেকর। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক সপ্তর্ষি সরকার, ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক গোবিন্দ নায়েক, জিজ্ঞাসার রাষ্ট্রীয় আহ্বায়ক ডাঃ আদর্শ সি রবি, জিজ্ঞাসার পশ্চিমবঙ্গ শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ তমাল মাজি, জিজ্ঞাসার রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ সৌরভ পাল। সারা দেশ থেকে আগত ৩৬ জন টপার ছাত্র-ছাত্রীকে মঞ্চে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করা হয়। বিদ্যার্থী পরিষদের ১০০ সদস্য সুবীর হালদার ও অভিজিৎ বিশ্বাসের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন সুকৃতী ছেত্রী ও তোচরি বি মারাক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ সৌরভ পাল।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের ডেপুটেশন

সারা দেশের প্রতিটি জেলায় একই দিনে ডেপুটেশন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সংগঠন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর শাখা গত ১৫ জুলাই জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় এবং ২১ দফা দাবিপত্র পেশ করা করে। দাবিগুলি হলো– কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ রাজ্যেও স্বশাসিত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন, কেন্দ্রীয় বাজেটের ৩০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়, কেন্দ্রীয় সরকারের হারে ষষ্ঠ ও সপ্তম পে কমিশনেরহ সুপারিশ কার্যকর করা, পুরনো পেনশন স্কিমতে ফিরিয়ে আনা, অতিদ্রুত শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ বৃত্তিমূল শিক্ষা— শারীরশিক্ষা ও কমপিউটার শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষারহ অন্তর্ভুক্ত করা, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকরণ বন্ধ করা, শিক্ষকদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, শিক্ষকদের সর্মকালের মেয়াদ ৬৫ বছর করা, শিক্ষাবহির্ভূত কাজকর্ম থেকে শিক্ষকদের মুক্ত রাখা, শিক্ষকদের প্রমোশন পদ্ধতি চালু করা, চাইল্ড কেয়ার লিভের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যামিলি কেয়ার লিভ চালু করা, শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ৩০ : ১ কার্যকর করা, শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ৮০ শতাংশ শিক্ষকদের বেতনের জন্য ব্যয় করা, সারা ভারতে একই শিক্ষানীতি গ্রহণ করা, প্রফিডেন্ট ফান্ড থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের সুবিধা প্রদান, সিসিআই (গ্রেডিং) পদ্ধতির বিলোপ সাধন, অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদান, সমকাজে সম বেতন।

জন্মাষ্টমী ভারতাত্মাকে জানার উৎসব

নন্দলাল ভট্টাচার্য

আঁধারঘন অমাবস্যা নিশি। শেষ রাতের আকাশে উঁকি মারে প্রতিপদের বাঁকা চাঁদ। দিব্য আলোকে কেমন যেন জ্বলজ্বল প্রকৃতি। এক হৃদয়হরা আনন্দের আভাস চারিদিকে। অন্ধকারের পরেই আছে আলোর দেশ— এ যেন তারই আগমনীবার্তা। অশুভশক্তি, অধম আর দুর্নীতিতে যখন চারিদিকে নামে অন্ধকার তখনই আলোয় আলোয় জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে তাঁর আবির্ভাব। যুগে যুগে একই সে লীলায় চারিদিকে পুলক, হিল্লোল। দ্বাপরেও দেখা গিয়েছিল সেই একই লীলার অবতারণা।

অধর্মের ভারে বসুধা তখন অবনত, পীড়িত। শোষণ আর নির্যাতনে জনগণ নিষ্পেষিত। মথুরায় কংস হয়ে উঠেছে সমস্ত অশুভ শক্তির এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। তার লোভ ও লালসা অগ্নিময় লাভার মতোই দগ্ধ করছে সকলকে। ধর্মনিষ্ঠ মানুষ পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। চারিদিকে শুধুই হাহাকার। চোখের জল, আর নীরব প্রার্থনা— এসো, প্রতিষ্ঠা করো ধর্মকে।

ভক্তের চোখের জলে টলে ভগবানের আসন। তাই তিনি অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প নিলেন মনে মনে। এবার অংশ নয়, পূর্ণাবতার রূপেই দেখা দেবেন। পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করবেন। নিরপেক্ষ, নির্মোহ এবং নির্মম মানসিকতায় তিনি এবার দুষ্টের বিনাশ, শিষ্টের পালন করবেন। এবার তাঁর বিচারের হাত থেকে রেহাই পাবে না তাঁর অতি আপনজনও। ধর্ম প্রতিষ্ঠার কারণে মদমত্ত নিজের কুলকেও ধ্বংস করবেন। ধর্ম আর শান্তি প্রতিষ্ঠাই হবে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। মানুষের শত্রু যারা, ধর্মের নাশক যারা তাদের সকলকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন। শান্ত ও রুদ্র— দুই রূপেই এবার দেখা দেবেন তিনি।

শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাবের পটভূমিটি তৈরি করেছিলেন মথুরারাজ কংস এবং চেদিরাজ শিশুপাল, দেবদ্বেষী, মানব নির্যাতনকারী এই দুজনের



নানা অশুভ কর্মে মধ্যাহ্নেই নামে কৃষ্ণা-শর্বরীর গভীর আঁধার। সেই আঁধারেই তিনি দেখা দেন আলোর বর্তিকা রূপে। সেই আলোয় ভেসে যায় সকলে। সেই আলোর মধ্যেই হারিয়ে যায় কংস আর শিশুপালের মতো মানবতার শত্রু। পৃথিবীতে আবার নেমে আসে শান্তি। ধর্মের পথে মানুষ হয় অমৃত পথযাত্রী।

এবার তাঁর আবির্ভাব যেন বড়ো তাৎপর্যময়। কোনও রাজার প্রাসাদ নয়, কোনো মুনিঋষির তপোবন অথবা কোনো ভক্তদম্পতির পর্ণকুটির নয়, এবার তিনি আবির্ভূত হলেন কারাগারের অন্ধকারে।

নানা দুঃখ-যন্ত্রণা, অধর্মের নানাবিধ



ক্ষণে এক ভয়ংকরের অবসানের ইঙ্গিতেই বিদ্যুৎ-চমকে প্রকম্পিত, অবিরাম বর্ষণে মুখরিত এই ধরণী। এক নতুন জীবনের জাগানিয়া গান শোনাবেন বলেই তাঁর কামড়ে নীল সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই তাঁর এবারের এই আসা। আর সে কারণেই তাঁর পার্থিব জনক-জননী দুষ্ট-অশিষ্ট অশুভ শক্তির হাতে পীড়িত মানুষের মতোই কংস-কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ। শেকল ভাঙার গান গাইবেন যিনি তিনি তাই এলেন শৃঙ্খলিত পিতা-মাতার কোলে। সকলকে তিনি নিষ্ণাত করাবেন মুক্তির আলোক ধারায়। তাই আলোর পথযাত্রী তাঁর আবির্ভাব নিবন্ধ্র আলোকহীন গভীর নিশীথে। অধর্মের রুদ্ররোষে বিশুষ্কপ্রায় ধরণীতে তিনি ঝরে পড়বেন নববর্ষার জলধারার মতো। তাই তাঁর আবির্ভাব

অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন চারিদিক।

পিতা বসুদেব এবং মাতা দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তিনি। তাই আবির্ভাবের তিথি হিসেবে বেছে নেন তিনি ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমীকে। কাল পঞ্জিকার একটি দিন চিহ্নিত হয়ে গেল সেদিন থেকেই পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথি হিসেবে। ভক্তি আর প্রাণের উৎসবে মেতে ওঠার দিন হিসেবে।

আকাশের মতোই তিনি অনন্ত, সীমাহীন, উদার এবং উন্মুক্ত। তাই আকাশের রং তাঁর গায়ে। আকাশের মতোই সকলকে ছায়া এবং আলো দেওয়ার প্রতীক যেন তাঁর ওই গাত্রবর্ণ। পীতবাসধারী তিনি। পৃথিবীর দুঃখভার লাঘবের জন্য তাঁর এই আসা। তাই পৃথিবীর রং-ই তাঁর গাত্রাবরণের বর্ণ। তাই বা কেন, তিনি বংশীধারী। তাঁর বাঁশিতে বাজে অনন্ত দিব্য জীবনের সুর। অবিরাম বেজে চলা সেই বাঁশি শুধু বৃন্দাবনের গোপিনীদের নয়, সমগ্র বিশ্বের ভক্ত আশ্রিত জনের কানে আজও বেজে চলে সেই একই ধারায়— একই সুরে। তাই তাঁর ওই বাঁশি দিব্য-অনন্তের প্রতীক।

শৃঙ্খল মুক্ত করার আশ্বাস নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। তাই তাঁর মর্ত্যে অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তেই শৃঙ্খল মুক্ত হলেন মাতা দেবকী, পিতা বসুদেব। উদ্ধার করবেন জীবজগৎকে— এমনই প্রতিশ্রুতি তাঁর। সেই প্রতিশ্রুতি রাখতেই পিতা-মাতাকেও শিশুর পাদপ্রহারের ছলেই দিলেন শ্রীচরণের স্পর্শ।

বসুদেব পুত্র বাসুদেব তিনি। কৃষ্ণা শর্বরীতে জন্ম তাই তিনি তিনি কৃষ্ণ। সকল কলুষ হরণ করবেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি জন্মমুহূর্ত থেকেই জগতের। সেই কারণেই কারাগারে বেশিক্ষণ সঙ্গ দিলেন না পিতা-মাতাকে। বাৎসল্য তাড়িত পিতা-মাতাকে কংসের রোষ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর জন্মমুর্তেই এক নির্মম সিদ্ধান্ত নিলেন। সদ্যোজাতকে বুকে নিয়ে মুগ্ধ পিতা এগিয়ে চলেন গোকুলের পথে নন্দালয়ে। জগতের যিনি, তাঁর সঙ্গে মায়ার বন্ধন ছিন্ন হলো যেন এভাবেই।

অন্ধকার, বর্ষণমুখরিত সেই রজনীতে বসুদেবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল এক শৃগাল। শেষনাগ অনন্ত তার ফণা বিস্তার করেই আতপত্রের মতোই বৃষ্টির ধারা থেকে আড়াল করে পিতা বসুদেব এবং শিশু কৃষ্ণকে। পথে পড়ল তরঙ্গমুখর যমুনা। কিন্তু কৃষ্ণকে বুকে নিয়ে বসুদেব যমুনা তটে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই জলধারা হলো দ্বিধাবিভক্ত। গভীর জলেই অগভীর জলপথ। সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলেন বসুদেব। সেই চলার মধ্যে অকস্মাৎ যমুনা হলো উত্তাল। উত্তাল তরঙ্গে ভেসে যাওয়ার উপক্রম। সেই তরঙ্গ বসুদেব বক্ষস্থিত বালগোপালের চরণ স্পর্শ করেই শান্ত হন। আবার সেই নিরাপদ পথ, আসলে সকলকে চরণের স্পর্শ দেবেন বলেই তাঁর এই লীলাভিনয়।

কাউকেই বঞ্চনা নয়, নিরাশ করা নয় কাউকে। তাই বুঝি অবিরাম বৃষ্টি। তাঁর গা এবং পা ছুঁয়ে সেই জল পড়ল ধরার বুকে। তারই মধ্য দিয়ে তাঁর স্পর্শ পেল বসুমতী। যমুনাও উত্তাল তরঙ্গবিভঙ্গে তাঁকে জানাল প্রণাম। গোকুলে তাঁর প্রবেশ মুহূর্তেও অবিশ্রান্ত সেই বৃষ্টি। সকলেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তারই মধ্যে সন্তান পরিবর্তন। নন্দরানি যশোদার সদ্যোজাত কন্যা যোগমায়ার জায়গায় কৃষ্ণকে শুইয়ে কন্যাকে নিয়ে বসুদেব ফিরে এলেন কংস কারাগারে। আবার সেই আগের অবস্থা। শৃঙ্খলিত পিতা-মাতা। নবজাতিকার কান্নায় ঘুম ভাঙে প্রহরীদের। সকলে সজাগ। দ্রুত খবর যায় মথুরারাজ কংসের কাছে।

ছুটে আসেন কংস। ক্ষণিক দ্বিধা। পুত্রের জায়গায় দেবকীর কোলে কন্যা দেখে মুহূর্তের বিভ্রান্তি। তারপর সেই কন্যাকে কেড়ে নিয়ে সজোরে আছাড় শিলাতলে। কিন্তু আশ্চর্য, সে কন্যা শিলায় না পড়ে আকাশগামী হয়। সেখান থেকেই অমোঘ বাণী, 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'।

এরও মধ্যে তাঁর করুণারই প্রকাশ। যার বিনাশের জন্য তাঁর এবারের আসা, তাকেও আগে থেকে সতর্ক করা। ভ্রান্তি দূর করা। নিজেকে নিরাপদ ভেবে যাতে নিশ্চেষ্ট না থাকে তারই জন্য কংসকে এভাবে জানিয়ে দিলেন তিনি, তিনি এসেছেন— তাঁরই হাতে মৃত্যু হবে কংসের। তাই এখন থেকেই তৈরি হও শেষের সেই দিনের জন্য।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এই দিনটিই সারা ভারতের ধর্মপ্রাণ মানুষ পালন করেন জন্মাষ্টমী উৎসব হিসেবে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, সারা ভারতের মানুষ ওই দিনটি কাটান উপবাস, পূজা অর্চনা, ভজন কীর্তন এবং নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বালক শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য প্রস্তুত করা হয় বিভিন্ন খাদ্যবস্তু। সেই নিবেদিত ভোগেই হয় যেন নন্দোৎসব।

দিনটিকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন জায়গায় বসে মেলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা মুহূর্ত নিয়ে রচিত নাটক, কীর্তন ইত্যাদি পরিবেশিত হয় গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায়। নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হয়। এরই অন্যতম হলো 'দহি হান্ডি'। বহু উঁচুতে ঝোলানো দইয়ের হাঁড়ি উদ্ধার মানব পিরামিড তৈরি করে।

শুধু ভারত নয়, ভারতের বাইরেও। নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশেও জন্মাষ্টমী উৎসব হয়। ভারতের বেশিরভাগ অনুষ্ঠানের মতোই জন্মাষ্টমীও কেবল কোনো সম্প্রদায় বিশেষের অনুষ্ঠান নয়। মেলা ও উৎসবের মধ্য দিয়ে এটি হয়ে ওঠে দেশের আপামর জনগণের প্রাণের উৎসব। সকলের প্রাণের উত্তাপে এই উৎসব শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় এক সর্বজনীন শুভ উৎসবের।

শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে জন্মাষ্টমীর সূচনা হলেও ব্যাপ্তির দিক থেকে এই উৎসব হয়ে ওঠে সকলের। সকলের মঙ্গলস্পর্শে ভরে ওঠে মঙ্গলঘট। আর তারই মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত ভারতের আন্তর রূপটি। জন্মাষ্টমী তাই শুধুই একটি তিথি বা উৎসব নয়, আসলে এটি ভারতাত্মাকে জানারই এক বিরামহীন প্রয়াস।

(জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বসঞ্চার



ইন্দোনেশিয়ার প্রাম্বানান মন্দির

ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ

অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ইন্দোনেশিয়ার জাভার প্রাম্বানান মন্দির বা 'লোরোজোঙ্গরাং'। ২৪০টি মন্দির নিয়ে এ-এক সুবিশাল কমপ্লেক্স যা প্রাম্বানান আর্কিওলজিক্যাল পার্কের অন্তর্গত। 'ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান' এই প্রাম্বানান মন্দিরটি ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম হিন্দু মন্দির এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বড়ো মন্দির প্রাঙ্গণ। ইউনেস্কোর মতে, 'The property is an outstanding religious complex, characteristic of Siva expression of the 10th Certury'...। মূলত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবকে উৎসর্গ করে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল আনুমানিক ৮৫০ সালে, শৈলেন্দ্র রাজবংশের রাজত্বের স্বর্ণযুগে।

প্রাম্বানান মন্দিরের অতুলনীয় কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে ৩টি প্রধান মন্দির যা বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মাকে উদ্দেশ্য করে নিবেদিত। এই ত্রিমূর্তি মন্দিরের সামনে রয়েছে ৩টি 'বাহন মন্দির'। অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ৩টি বাহনের মন্দির। সেগুলি যথাক্রমে, গরুড়, নন্দী ও হংস-কে নিবেদন করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণে ত্রিমূর্তি ও বাহন মন্দিরগুলির মধ্যে রয়েছে ২টি 'অর্পিত মন্দির'। অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের ৪টি প্রধান প্রবেশ দ্বারের ঠিক বাইরে রয়েছে ৪টি ছোটো 'কিলিং মন্দির'। এই অত্যন্তরীণ অঞ্চলেরই ৪টি কোণে রয়েছে ৪টি ছোটো 'পটক মন্দির'। বাকি ২২৪টি 'পারভারা মন্দির'— কমপ্লেক্সের ভিতরের অংশ ও বাইরের অংশের মাঝ বরাবর 'চারদিকে সমকেন্দ্রিক বর্গাকারে' সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো। বাইরের সারি থেকে ভিতরের সারির মন্দিরগুলির সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪, ৫২, ৬০ এবং ৬৮। মন্দির চত্বরের একেবারে ভিতর অংশে ৪৭ মিটার উঁচু কেন্দ্রীয় ভবনটি অবস্থিত। এখানে ভগবান শিব পূজিত হন। প্রাম্বানানের অত্যাশ্চর্য মন্দিরটি আসলে হিন্দুদের 'স্বর্গ' সম্বন্ধীয় ধারণাটিকে প্রকাশ করছে ('Pramlearar exudes Hindu canceptions of heaven'–Ancient History Encyclopedia)...।

গোটা মন্দির প্রাঙ্গণটি ৩টি অংশে বিভক্ত। পবিত্রতম অভ্যন্তরীণ অংশে মোট ৮টি প্রধান মন্দির এবং ৮টি ছোটো মন্দির রয়েছে। দ্বিতীয় অংশটিতে রয়েছে কয়েকশো ছোটো মন্দির। এর পরে রয়েছে মন্দির চত্বরের একেবারে বাইরের অংশটি। তবে প্রাম্বানান মন্দির চত্বরের অধিকাংশ মন্দিরই বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও, মন্দিরটির আধ্যাত্মিক ও শৈল্পিক মূল্য অপরিসীম। অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'প্রাম্বানান মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্রাবলীতে বিষ্ণুমন্দির গাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা বিষয় অথবা লোরোজোঙ্গরাং শিব মন্দিরের রামায়ণী চিত্র সমূহে একটা মানবতার আভাস পাওয়া যায়। এই কারণে এইগুলি আমাদিগকে অধিকতর আনন্দদান করে। মনে হয় যেন আজন্ম পরিচিত রামায়ণ মহাকাব্যটি প্রস্তরলিপিতে পাঠ করিতেছি'। ইউনেলো বলেছে, পাথরে উৎকীর্ণ রামায়ণের শিলা-উৎকর্ষের কোনো তুলনা হয় না (The Hindu temples are decorated with reliefs illustrating the Indonesion version of the Ramayana epic which are mesterpieces of stone carvings)...। প্রসঙ্গত, প্রাম্বানান মন্দির প্রাঙ্গণে সেই ১৯৬১ সাল থেকে প্রত্যেকদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে 'রামায়ণ-ব্যালে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যে কোনো স্টেজ শোয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশ্বরেকর্ড। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই ব্যালে শিল্পীদের অধিকাংশই অন্য ধর্মের মানুষ। প্রাম্বানান মন্দিরের আরও এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মা দুর্গার এক জগতবিখ্যাত মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। ইতিহাস বলছে, ১৫ শ থেকে ১৬ শ শতাব্দীর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে প্রাম্বানান মন্দির ও সংলগ্ন অঞ্চলের ৫০০টিরও বেশি মন্দির শুধুমাত্র এক অসামান্য স্থাপত্য ও সংস্কৃতির নিদর্শন বহন করছে শুধু নয়, এগুলি এখানকার শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সহাবস্থানেরও প্রমাণ। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'— ভারতীয় সংস্কৃতির এই অন্যতম মন্ত্রটি একসময় ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে। ইন্দোনেশিয়ার প্রাম্বানান মন্দির তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর



BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

তিনি সবুজ

শেখর সেনগুপ্ত

সাতসকালে লোকালয়ে এ দৃশ্য অসচরাচর। একসঙ্গে তেইশটা বাইক সগর্জনে একটার পর একটা বাঁক পেরিয়ে ছুটেছে গণেশপুরের পুরপতি সবুজ চৌধুরীর ইন্দ্রপুরী 'সবুজালয়'-এর দিকে। এরা কারা তা জানাতে নিশ্চয় কোনও বর্ণনা বা ভাষণের দরকার নেই। সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, কাটমানি আদায়ে সহায়তা, যুগপৎ পূজা ও দাঙ্গায় সোল্লাসে ভাষা পরিবর্তন... এক কথায় তারাই সবুজাশ্রিত দুর্মূল্য বাহিনী। খবরটা তাদের কাছে এসেছিল শেষরাতে। ভয় আর আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছে। তেইশটি মাথা এক হতে সময়ও নিয়েছে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। আরও একজন সাইকেলে



চেপেই চলেছেন 'সবুজালয়'কে নিশানা করে। তিনি সাংবাদিক অভিজিৎ মিত্র। মিডিয়ার নাগালে গোটা বৃত্তান্তকে নিয়ে আসবার বাহাদুরি তাঁকে দিতেই হবে, যেহেতু অভিজিৎ মিত্র গণেশপুরেরই বাসিন্দা। এ এলাকায় সকাল থেকে রাত অবধি অতঃপর যত বৌদ্ধিক, নৈতিক, আত্মিক আলোচনা সমালোচনা উড়তে থাকবে, সবকিছুর মূলে থাকবে ওই একই বার্তা— প্রৌঢ়ত্বের কোঠাতে আবদ্ধ সবুজ চৌধুরী বেমক্কা ছেড়ে চলে গেলেন অন্য কোন এলকায় পুরপিতৃত্ব জাহির করতে।

এ বার্তায় কেউ খুশি, কেউ বিব্রত। সাইকেলে প্যাডেল মারতে মারতে অভিজিৎ মিত্র সবুজ চৌধুরীর মূল্যায়ন করে চলেছেন। এই মানুষটার উত্থান মানেই আধুনিক রাজনীতির চালচিত্রকে চিনে নেওয়া। প্রবল চোরাটান। আবর্ত। ধুরন্ধর, নির্ভীক এক কুশীলবকে শনাক্তকরণ। অভিজিৎ এলাকার অন্যতম প্রবীণ রাজনীতি বিশারদ গৌতম সেনগুপ্তর কথাগুলিকে স্মরণে আনলেন, 'সবুজরে আমি চিনি ছোট্টবেলা থিকা। বাপ ছিল প্রাইমারি টিচার। ছেলে বাইছা বাইছা কেবল মাইয়াদের পড়াইত। তারপর সলতে পাকায় রাজনীতিতে। খেলাধুলার মন্ত্রী গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর চেলা হইল। আর পিছন ফিরা তাকাইতে হয় নাই। আমি যখন গ্রামপ্রধান, ও তখন উপপ্রধান। পরে আমারে টপকাইয়া কোথায় উইঠা গেল। গ্রামট্রাম ফক্কা। সব পুরএলাকা। আর তার চেয়ারম্যান সবুজ চৌধুরী। ফুইল্যা ফাঁইপ্যা একসা। গোছা গোছা টাকা আসে। তার কিছুটা খরচা কইর‍্যা গরিবের মন ভজায়। ভোটে জেতে। আবার বিপদ টের পাইতেই এক দল ছাইড়্যা অন্য দলে ঢুকলো। গদি ঠিক থাকলো। যান না, ওরে নিয়া লেখেন।...'

গৌতম সেনগুপ্ত এখন আর রাজনীতিতে বিচরণ করেন না। তবে মুখ একবার খুললে তাঁকে ক্ষান্ত করা কঠিন। অভিজিৎ অবশ্য দিশা পেয়েছেন। সবুজ চৌধুরীর নিবাসে এ যাবৎ তিনবার ঢুঁ মেরেছেন। ইয়াব্বড় 'সবুজালয়'। সপ্তাহে তিন দিন সকালে চেয়ারম্যানের আমদরবার বসে সেখানে। আগে নাম লেখালে তবেই প্রবেশাধিকার। তবুও সে বুঝি এক অ্যাকোরিয়াম ঠাসা বিস্তর মাছের গিজ গিজ। অধিকাংশ হাভাতে পরিবারের। শরীরের নাড়িভুঁড়িগুলিও দয়া চায়। প্রথমদিন ঢুকে অভিজিৎ একরকম অবশ অসাড়। সবুজ তথায় দাতাকর্ণ। যাদের ঘরবাড়ি নেই, তাঁদের টাকা দিচ্ছেন চালা তোলার জন্য। যাদের চিকিৎসা করাবার সামর্থ্য নেই, তাঁদেরও দিচ্ছেন কিছু কিছু। ...প্রার্থী যদি স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী হন, মহাপরাক্রান্ত পুরপিতা তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করেন যেন এতাবৎ কপর্দকহীনাকে তিনি রানির মর্যাদা দিতে উন্মুখ।

বাইক ছুটছে। সাইকেলের চাকাও ঘুরছে। দুঁদে সাংবাদিকের মাথায় টুকরো টুকরো শব্দের ও ছবির আবৃত্তি পুনরাবৃত্তি। যাঁর বাপ প্রাইমারি স্কুলের টিচার, যাকে দু'বেলা টুউশানি করতে হয়েছে... ওই দেখুন তাঁর ম্যানশন— যেখানে সপ্তাহে তিন দিন আম দরবার। রাজনীতিতে জাদুকর না হতে পারলে এ ভেলকি আর কে দেখাবে? নীতির মোড়কে মোড়া দুর্নীতির ইকোয়েটর বা অক্ষরেখা ধরে এগিয়ে যেতে হবে। তোলাবাজি, কাটমানি, ঘুষ, মাঝেমধ্যে মেজাজের বারুদে আগুন...সব রপ্ত করতে হয়েছে। এখানে অমনোযোগীর ঠাঁই নাই। তবেই না অমন আধিপত্যলাভ!

অভিজিৎ বিড় বিড় করেন, তোমাকে নিয়ে আমি একখানা কিতাব লিখবো, সবুজ দাদা। উত্থান তো তোমার লালপতাকা উড়িয়ে। সর্বহারাদের

সর্বহারা নেতা। লাউড স্পিকারে ভুলভাল তথ্যে ঠাসা তোমার গরম ভাষণ, শুনছে শ' শ' ক্লিষ্ট মুখ, 'যাঁরা আপনাদের শোষণ করে চলেছে, তাঁদের চিনে রাখুন। ভোটবাক্সে বারুদ ভরে দিন। বিস্ফোরণে উড়ে যাবে প্রতিক্রিয়াশীলরা।...'

বিস্ফোরণ ঘটে। তারপর তিন দশকের ওপর এলাকা লালে লালময়। পর্ণনিবাস প্রাসাদ হলো। তিনখানা চারচাকা। কত বড়ো বড়ো মহড়া। কিন্তু তিনি তো আদতে সবুজ। লালটা তাঁর ভেক। তাই সবুজের কাল আসতেই তাঁর কমন পরিবর্তন। তাতে ক্ষমতা, পদগৌরব বেড়েছে বই কমেনি। আমদরবার এখন আরও বড়ো। গরিব-গুর্বোদের দিকে খুচখাচ টাকা ছুঁড়েই চলেছেন।

কিন্তু অত টাকা আসছে কোত্থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই কলমচি অভিজিতের আমদরবারে প্রথম দিনের হাজিরা ফালতু অছিলায়। ভেতরে এত ভিড় যে তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকাটাই যেন শ্রেয়স্কর। আত্মানন্দে বিভোর সবুজ বসে আছেন তাঁর গদিতে। দু'পাশে তাঁর দু'জন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। বিভূতিচরণ চোঙদার এবং গোকুলানন্দ গুছাইত। দু'জনের কোলে একটা করে চামড়ার ব্যাগ। দুটো ব্যাগেই রয়েছে গুনেগাঁথা গুচ্ছের নোট। এবং কে না জানে যে টাকা কখনও ন্যায়-অন্যায়, স্তুতি-নিন্দার ধার ধারে না। কেবল যিনি ওদের হকদার, তাঁর যেন একটা নামডাক থাকে। যেমনটি রয়েছে পুরপ্রধান সবুজ চৌধুরীর। আর্তদের আর্তি শুনতে সপ্তডিঙায় ভেসে এসেছেন তিনি। প্রশ্ন, 'তোর কী বলার আছে রে, রহিমা?'

'বাচ্চাটার কৃমি। ডাক্তারকে ফি দিতে গিয়েই আমি ফতুর। ওষুধ কেনার পয়সা নাই।'

নিদান এল, 'চোঙদারবাবু, রহিমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিন।'

আবার একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি, 'আরে মালাকার যে, তোমার কী চাই?'

'দাদা আপনি তো জানেন, আমি এখন পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল। বাড়ি রং করাতে গিয়ে ফেঁসে গেলাম। যদি দু'টিন রঙের দাম—'

মালাকারের গলার স্বর স্তিমিত হতে হতে একেবারে থেমে যায়। কিন্তু আমদরবারের পরিবেশ তো অসুন্দর, কুশ্রী হয়ে উঠতে পারে না। তাই বেমক্কা দাপিয়ে হেসে ওঠেন স্বয়ং চেয়ারম্যান, 'অর্থাৎ তুমি স্বয়ং রঙিন হতে চাও। ঠিক আছে, আমিই তোমাকে রাঙিয়ে দিচ্ছি। ও গোকুলানন্দবাবু, মালাকারকে গুনে গুনে দেড় হাজার টাকা দিয়ে দিন।'

এবার দরবারে সমস্বরে ওঠে জয়গান।

আরও কয়েকজনকে প্রফুল্ল করবার পর দাতাকর্ণের নজরে এসে গিয়েছিলেন অভিজিৎ মিত্র। পায়ের কাছে রাখা কোনও একজনের হেলমেটকে হালকা লাথি মেরে সবুজ চৌধুরী চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, 'কী সৌভাগ্য, আমার বাড়িতে সাংবাদিক অভিজিৎ মিত্র। বলুন, কী করতে পারি আমি আপনার জন্য??

অভিজিতের সলজ্জ আবেদন, 'আমার মাথায় অনেক দিন ধরে একটা পরিকল্পনা ঘুরছে। যদি অভয় দেন—'

'বলে ফেলুন, বলে ফেলুন। আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি কোরাস গান গাইতে। এখানে কোনও লজ্জা-সঙ্কোচ লুকোছাপার ব্যাপার নেই। আপনি বলুন।'

অভিজিতের নাড়ীতে স্পন্দন বাড়ে; তবে স্বর অকম্পিত, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, আপনাকে সম্পাদকের আসনে বসিয়ে এই এলাকা থেকে আমি একটি মাসিক পত্রিকা বের করবো। অনেক খরচের ব্যাপার। বিজ্ঞাপনও জরুরি।'

সবুজ চৌধুরী এবার সত্যিই অভিভূত। যেন কাতর গলায় বললেন, 'মিত্র আপনার মতো মানুষ এলাকায় দ্বিতীয় কেউ নেই। আপনি এই রকম সভায় নয়, কাল সন্ধ্যায় আমার দোতলার ঘরে আসুন। কথা হবে নিরিবিলিতে।'

পর পর তিন সন্ধ্যায় অভিজিৎ মিত্র গিয়েছিলেন অতঃপর পুরপ্রধানের খাসকামরায়। সেখানে যেন রহস্যময় সাঁঝের আলো। পত্রিকা প্রকাশের অছিলায় সাংবাদিক প্রত্যক্ষ করলেন সবুজ চৌধুরীর তোলাবাজি ও কাটমানির বহরকে। ডুমুরমল ভুতুড়িয়া, রসরাজ নায়েক, কানাই সেন... এই সমস্ত প্রমোটাররা টাকার থলে নিয়ে ঢোকেন এবং হালকা হয়ে হাসিমুখে ফিরে যান। আসেন আরও কত রকমের ব্যাপারীরা। এত টাকা যে বিভূতিচরণ চোঙদার ও গোকুলানন্দ গুছাইত গুনে শেষ করতে হিমশিম। সবুজ তখন অকপট। অভিজিতের পিঠে হাত রেখে বলেন, 'সব টাকাই আমার ভোগে লাগে না। এর তিরিশ ভাগ আমি বিলি করি দরবারে বসে। দশ ভাগ যায় বাইকবাহিনী পুষতে। তা হলে আর কত রইল? এবার আমাদের কাগজের পিছনে ঢালব। কী লেখক, ঠিক বলছি তো?'

সেই প্রস্তাবিত পত্রিকা আর কোনও দিন সূর্যের মুখ দেখবে না। গত রাতে নিশ্চয় মদ্য পানের আসরও বসেছিল। তারপর শেষ রাতে সব শেষ।

রুদ্ধশ্বাস গতিতে ছুটে এসে তেইশখানা বাইক থামল 'সবুজালয়'-এর সামনে। সাইকেলে চেপে এসে গেলেন অভিজিৎ মিত্রও।

কিন্তু একী!

আর কেউ তো আসেনি।

খবর ছড়িয়েছে বাতাসের বেগে। অথচ সাধারণ মানুষদের একজনও আসেননি। এ বড়ো রহস্য। ■

ভারতীয় মুসলমান মহিলাদের নবজাগরণের পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন মোদী

সোমনাথ গোস্বামী

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়ে ৬৮তম স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীর উদ্দেশে লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছিল যে তিনি শুধু তিন দশক পরে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতে আসা একজন প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি এই বহুধাবিভক্ত ১৩০ কোটি মানুষের সত্যিকারের অবিভাবক। তিনি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নকে সমাজের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দিতে যেমন বদ্ধপরিকর, তেমনি স্বাধীনতার পর থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে তোষণ ও ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনীতির ফলে যে সামাজিক বিকৃতি এদেশের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে তারা সমূলে উৎপাটন করতেও তিনি বদ্ধপরিকর। তিন তালাক এই রকমই একটি সামাজিক বিকৃতি যাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ১৯৮৬ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। বিগত ১৯ মাসে তৃতীয় প্রচেষ্টায় অবশেষে সংসদের উচ্চতর কক্ষে কিছু রাজনৈতিক দলের শুভবুদ্ধি উদয় হওয়ার সৌজন্যে কংগ্রেসের করা আরও একটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। তবে এক্ষেত্রেও তোষণবাদী দলগুলি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে বিলটিকে রোখার। তবে তারা ব্যর্থ হয়েছে। আর তাই ৩০ জুলাই দিনটি ভারতীয় মহিলাদের ক্ষমতায়ণের ইতিহাসে এক বিশেষ দিন হিসেবে লেখা থাকবে যেদিন তিন তালাক নামক এই মধ্যযুগীয়, আমানবিক, বর্বরোচিত প্রথার হাত থেকে এই দেশের অগণিত মুসলমান মহিলাদের মুক্তির পথ খুলে দেওয়া হলো। তবে টিভির পর্দায় যারা রাজ্যসভা এবং লোকসভায় এই বিলটির উপর আলোচনা দেখেছেন তারা আরও একবার অনুধাবন করতে পেরেছেন যে নির্লজ্জ তুষ্টিকরণ এই দেশের রাজনীতির মজ্জাগত হয়ে গেছে। এই ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনীতি যা ক্রমেই সংবিধান, সমাজ, এমনকী মানবিকতার বুনিয়াদটুকুকেও গ্রাস করে নিয়েছে, তাকে রোখা না গেলে এক ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাব। তোষণ নামক এই বিকৃতিটি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটু একটু করে সংযুক্ত হতে হতে আজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ফেলেছে। আমরা যদি আমাদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাবো যেখানে একটি ধর্মীয় আগ্রাসনকে খুব সুচতুর ভাবে রাজনীতির মোড়কে এই ভূখণ্ডে বিকশিত হবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে উত্তরপ্রদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের তামাম হিন্দু সিপাহীরা মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে নিজেদের সম্রাট ঘোষণা করে ইউরোপীয় শাসকের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেখানে তারা নিজেদের ধর্মীয় সত্তার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতমাতার সন্তান হিসেবে বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এই উদারতা এই দেশপ্রেমের বিনিময়ে হিন্দুরা কী পেল?

মহাবিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হওয়ার আগেই ধর্মের ভিত্তিতে আস্ত একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা হলো। তারপর প্রথমে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং ধীরে ধীরে দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে এই ভূভাগ খণ্ডিত হলো এবং ইংরেজদের এই উপমহাদেশকে লুণ্ঠন করার কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করা হলো। আর এই সবই হলো কংগ্রেসের ছত্রচ্ছায়ায়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস লখনৌ অধিবেশনে মুসলিম লিগের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীকে স্বীকৃতি যদি না দিত তাহলে এই দেশের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতে পারতো। ধর্মীয় তুষ্টিকরণের যে অঙ্কুরোদ্গম ১৯১৬ সালে হয়েছিল তাই আজ বিরাট বিষবৃক্ষ হয়ে এই দেশের সমাজ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, এই তুষ্টিকরণের হাত থেকে সংবিধানও রক্ষা পায়নি। ভারতের সংবিধানের চতুর্থ ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি সমূহের উল্লেখ আছে। যেখানে এক একটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রকে কী করে কল্যাণকর ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা যায় তার দিক নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। যেমন অনুচ্ছেদ চল্লিশে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের কথা বলা হয়েছে, অনুচ্ছেদ ছেচল্লিশে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়েছে, অনুচ্ছেদ ঊনপঞ্চাশে দেশের প্রাচীন স্থাপত্য সমূহের সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের এই ভাগে মোট সতেরোটি অনুচ্ছেদে এইরকম বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশগুলিকে রূপায়ণের কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দুটি অনুচ্ছেদকে কখনোই গুরুত্ব দেবার চেষ্টা হয়নি। একটি অনুচ্ছেদ নং ৪৪ যেখানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলনের কথা বলা হয়েছে আর অনুচ্ছেদ নং ৪৮ যেখানে গোরক্ষার কথা বলা হয়েছে। যে সংবিধান সভার অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেসের, সেই সংবিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সাংবিধানিক নির্দেশগুলিকে স্বাধীন ভারতে সুদীর্ঘ শাসনকালে কংগ্রেস শুধুমাত্র উপেক্ষাই করেনি, এগুলি যাতে বাস্তবায়িত না হয় তার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। তাই তিন তালাক নিয়ে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসের উপজাত আঞ্চলিক দলগুলি যে এর বিরোধিতা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই তুষ্টিকরণ আর ধর্মীয় আগ্রাসনের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে দেশবাসীকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

গাছের আহার

গাছের জীবন আছে এটা আমরা জেনেছি। মানুষ,পশু ও পাখির মতো গাছও জীবন্ত। মানুষের যেমন জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, গাছেরও তেমন জন্ম-মৃত্যু আছে। মানুষের যেমন শৈশব ও বার্ধক্য আছে, গাছেরও তেমন আছে। মানুষ যেমন ছোটো থেকে বড়ো হয়, গাছও তেমনি ধীরে ছোটো থেকে বড়ো হয়। মানুষের আহার দরকার, তেমনি গাছেরও আহার ছাড়া চলে না।

গাছের আহার আবশ্যক। এই আহারে গাছের বৃদ্ধি হয় ও তার শরীর রক্ষা হয়। আহার বন্ধ করলে গাছের পুষ্টি হয় না। গাছ মাটির ভিতর দিয়ে শিকড় চলায়। সেই শিকড় দিয়ে মাটি থেকে রস টেনে নেয়। যদি রোদের উত্তাপে মাটি অনেকদিন শুকিয়ে থাকে, তাহলে গাছ বেশি রস পায় না। গাছ শুকিয়ে মরে যায়। বড়ো বড়ো গাছ মাটির অনেক নীচে পর্যন্ত শিকড় চালিয়ে রস আকর্ষণ করতে পারে। ছোটো ছোটো গাছের শিকড় তত দীর্ঘ নয়, তারা বেশি দূর থেকে রস টেনে আনতে পারে না। এই সব দেখে তোমাদের হয়তো বিশ্বাস জন্মেছে যে, রসই গাছের প্রধান খাদ্য। গাছের প্রধান খাদ্য রস নয়। তার প্রধান খাদ্য বায়ু। রস না হলে গাছের কিছুদিন চলতে পারে, কিন্তু বায়ু না হলে চলে না। গাছের শরীরের নানা অংশ। কাঠ, পাতা ছাল ইত্যাদি। এর মধ্যে যেকোনো অংশ উত্তাপ দিয়ে গরম কর, দেখতে পাবে তা ধীরে ধীরে কালো হয়ে আসছে। গরম করলে খানিকটা জল বের হয়ে যায়। যা পড়ে থাকে তা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। তাকে কয়লা বলে। কাঠ, পাতা, ঘাস, খড়, যেকোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থ হোক না কেন, গরম করলে বা আধপোড়া করলে খানিকটা জলীয় ও বায়বীয় ভাগ বের হয়ে যায়। যা অবশিষ্ট পড়ে থাকে তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তার নাম কয়লা। এই কয়লাকে আবার পোড়াও দেখতে পাবে কয়লা প্রথম গরম হয়ে রাঙা হয়ে উঠবে ও ক্রমে ক্ষয় হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত কয়লা পুড়ে যাবে। কেবল একটু সাদামতো পদার্থ অবশিষ্ট আকে। সেটুকু আর পুড়তে চায় না।



তার নাম ছাই বা ভস্ম। যত চেষ্টা কর এই ছাইটুকু কিছুতেই পুড়বে না। কাঠ, খড়, ঘাস, পাতা এগুলির মধ্যে কয়লা আছে, ছাইও আছে। কয়লার ভাগ অনেক বেশি, ছাই অনেক কম। এখন প্রশ্ন, এতটা কয়লা ও এইটুকু ছাই এল কোত্থেকে? দুটো জলের বাটি নাও। একটাতে কয়লা ফেলে দাও আর একটাতে ছাই ফেলে দাও। দেখবে কয়লা কোনো মতেই জলের সঙ্গে মিশবে না। কিন্তু ছাই তেমন নয়, অল্পক্ষণেই ছাই দ্রবীভূত হয়ে জলের সঙ্গে মিলে যাবে। ছাই গলে যায়, কয়লা জলে গলে না। আবার কয়লা পুড়ে যায়, ছাই কোনোক্রমেই পোড়ে না।

কয়লা পুড়ে বায়ুতে মিশে যায়। বায়ু নানারকম। সব বায়ুর গুণ সমান নয়। কয়লা পুড়ে যে বায়ু হয়, সে এক রকমের বায়ু। এ বায়ু আমরা চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু অন্য উপায়ে তাকে ধরতে পারি। আর এক রকম বায়ু আছে, তা নইলে আমরা বাঁচি না। বায়ুতে আমরা নিঃশ্বাস নিই। নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় সেই বায়ু আমাদের শরীরে মিশে যায়। সেই বায়ুতেই আবার প্রদীপ জ্বলে। বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিলে প্রদীপ জ্বলে না, আগুনও জ্বলে না। আবার সেই বায়ু ছাড়া আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি না। একে বলব এক নম্বরের বায়ু। আর এক রকমের বায়ু আছে তার গুণ অনেকাংশে বিপরীত। এই বায়ুর মধ্যে মানুষকে রেখে দিলে তক্ষুনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে যাবে। এই বায়ুর মধ্যে প্রদীপ রেখে দিলে নিভে যায়। একে দুই নম্বরের বায়ু বলব।

আমরা যে বায়ুরাশির মধ্যে সঞ্চরণ করছি, পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুরাশি আছে, যে বায়ুরাশি একটু নড়লেই ঝড় হয়, সেই বায়ুরাশির মধ্যে উভয় বায়ুই বর্তমান। এক নম্বরের বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে আছে, দুই নম্বরের বায়ু অল্প পরিমাণে আছে। এই দুই নম্বরের বায়ু যে অল্প পরিমাণে আছে তাতেই গাছপালার জীবন রক্ষা হয়। অধিকাংশ গাছ শতসহস্র সবুজ পাতা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষ, পশু, পাখি খাদ্যসামগ্রী উদরস্থ করে। পাতা হলো গাছের উদর। সূর্যের কিরণে দুই নম্বর বায়ু থেকে যে কয়লা বের হয়, গাছের পাতা সেই কয়লাকে গ্রাস করে ও আত্মসাৎ করে। কয়লা পাতার সঙ্গে মিশে যায়। এভাবে গাছের শরীরে তার পাতায় রৌদ্রের সাহায্যে কয়লা জমা হতে থাকে। গাছের প্রধান খাদ্যই কয়লা। গাছ এভাবে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে। সূর্যকিরণের সাহায্য না পেলে পাতা আপনা থেকে কয়লা সংগ্রহ করতে পারে না। এজন্য সূর্যকিরণের অভাবে গাছ বাড়ে না। গাছের বৃদ্ধির জন্য সূর্যকিরণ অবশ্যক। এখন বুঝতে পারলে গাছের প্রধান আহার কী?

শ্যামল চক্রবর্তী

ভারতের পথে পথে

প্রয়াগরাজ



গঙ্গা,যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গমে প্রয়াগরাজ শহর। তিন নদীর এই মিলনস্থল পবিত্র হিন্দুতীর্থ। প্রতি বারো বছর পূর্ণকুম্ভ আর ছ'বছরে অর্ধকুম্ভমেলা বসে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পবিত্র সঙ্গমে স্নান করে পুণ্য অর্জন করে। এ বছর দেশ-বিদেশের ৫ কোটি মানুষ প্রয়াগরাজে স্নান করেছেন। মুঘল সম্রাট শাহজাহন এর নাম বদল করে এলাহাবাদ রাখেন। কিছুদিন আগে এর নাম আবার প্রয়াগরাজ করা হয়েছে। ত্রিবেণী নামেও পরিচিত এই শহর। পৌরাণিক যুগে এর নাম ছিল বারাণাবত। রামায়ণ, মহাভারত, এমনকী বহু পৌরাণিক গ্রন্থে প্রয়াগরাজের উল্লেখ আছে। দর্শনীয় হিসেবে রয়েছে কাম্যকূপ, অক্ষয়বট, পাতালপুরী মন্দির, অশোক পিলার, আনন্দভবন, হাইকোর্ট, ভরদ্বাজ আশ্রম, বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম, আলফ্রেড পার্ক, সুমিত্রানন্দন বাল উদ্যান, বাসুকী মন্দির, মনকামেশ্বর শিব মন্দির ইত্যাদি।

জানো কি?

- ভারতে এই মুহূর্তে ২৮ টি রাজ্য।
- নয়টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল।
- জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ নতুন দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল।
- কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার সর্বপ্রথম বিরোধিতা করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
- এর জন্য তিনি ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে প্রাণ বলিদান করেন।
- জওহরলাল নেহরু ও শেখ আব্দুল্লার পরিকল্পনায় ৩৭০ ধারা চালু হয়েছিল।
- ৩৭০ ধারা এখন বিলুপ্ত।

ভালো কথা

পাতাল চণ্ডী

মালদা শহরের কাছেই কাঞ্চনতার গ্রামের কাছে পাতাল চণ্ডী মন্দির। অনেকবার বাবার কাছে ওই মন্দিরের কথা শুনেছি। অনেক বছর আগে শাখার কোনো অনুষ্ঠানে বাবা ওই মন্দিরে গেছিলেন। তখন নাকি সবে ওই মন্দিরের খবর পাওয়া গেছে। অমারও খুব ইচ্ছা করছিল মন্দিরটি দেখার। এক রবিবার বাবা ও মা'র সঙ্গে মন্দির দেখতে চললাম। বাস থেকে নেমে হাঁটা পথ। উৎসব অনুষ্ঠান হলে টোটো, অটো পাওয়া যায়। সেদিন সেরকম কিছু ছিল না। আমার খুব মজা লাগছিল। একদিকে উঁচু উঁচু ঢিবি, অন্যদিকে বড়ো বড়ো জলাশয়। তাতে জেলেরা মাছ ধরছে। ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তা মন্দিরের দিকে গিয়েছে। মন্দির সেবাইতরা আমাদের আপ্যায়ন করে বসালেন। পুজোর প্রসাদ দিলেন। আমি অনেক ছবি তুললাম। এরকম শান্ত সুন্দর পরিবেশ আমার খুব ভালো লাগছিল। এক সময় নেমে গেলাম মন্দিরের গর্ভগৃহে। ওখানে মা চণ্ডী অবির্ভূতা হয়েছেন। মন্দিরের পূজারি ও পুরোহিতদের ব্যবহার আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে। আমার ইচ্ছা, আবার সেখানে যাই।

সমন্বিতা সাহা, চতুর্থ শ্রেণী, মঙ্গলবাড়ি, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) য় গ্রা হ্র হী	(১) ৎ কি সা চি বি ট ভ্রা
(২) ত্ত প খা র	(২) ন্ন ম ল ভি তা ব ম্বী

২২ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) মুখরোচক ২) রাসপূর্ণিমা

২২ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) সংসারবৈরাগ্য (২) শতদলবাসিনী

উত্তরদাতার নাম

(১) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (২) শুভদীপ বাগ, আন্দারথোল, বাঁকুড়া। (৩) আলাপন দলই,হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (৪) প্রতীম সেন, বেথুয়াডহরী, নদীয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

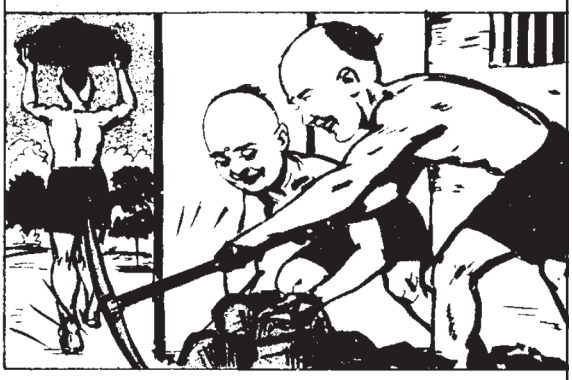
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ৩।।

কী করা যায় তা নিয়ে কেশব সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করল।



পরের দিনই ওয়ঝে গুরুজীর বাড়িতে শুরু হয়ে গেল বালক দেশভক্তদের গোপন প্রয়াস।



বিকেলে ওয়ঝে গুরুজী বাড়ি ফিরে...



ওয়ঝে গুরুজী ছেলেদের সব কথা বুঝিয়ে বললেন। তারা বুঝলও। কেশবের মহৎ ভাবেরও প্রশংসা করলেন তিনি।



ডাক্তারজী দেশভক্ত স্বয়ংসেবক, জ্যোতিবাবু ব্রিটিশভক্ত কমিউনিস্ট

অজয় সরকার

এদেশের কমিউনিস্টরা অনেকটা ঝি ঝি পোকার মতো। কান ঝালা পালা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এদের জুড়ি পাওয়া যায় না। এরা ঐক্যতান ধরেছে যে, আর এস এস দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছুই করেনি। এদের মধ্যে যারা ইঁচড়েপাকা এবং অশালীন ভাষা প্রয়োগে কুশলী, তারা এটাও বলেন, আর এস এস দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রিটিশদের পা চেটেছে, মুচলেকা দিয়েছে, ইত্যাদি।

আমি অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে কমিউনিস্টদের নেতা জ্যোতিরিন্দ্র ওরফে জ্যোতি বসু এবং আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের বাল্যজীবন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অংশগ্রহণের উপর একটু তুলনামূলক আলোচনা করছি।

জ্যোতি বসুর জন্ম ১৯১৪ সালের ৮ জুলাই কলকাতার ৪৩/১ হ্যারিসন রোডের বাড়িতে। কিন্তু তিনি বড়ো হয়েছেন ৫৫এ হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে। পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার নিশিকান্ত বসুর ওটা সাধারণ বাড়ি নয়, বলতে গেলে এক পেল্লাই রাজপ্রসাদ। এক কথায় সোনার চামচ মুখে নিয়ে এই প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতার জন্ম। তখন দেশে ব্রিটিশ শাসন। কলকাতার লোরেটো স্কুল ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্থাপিত। ভারতীয়দের মধ্যে যারা প্রভুভক্ত, তাদের ছেলে-মেয়েরা অবশ্য ব্রিটিশদের কৃপা পেত। এছাড়া, লরেটো হলো একটা কনভেন্ট, খ্রিস্টধর্ম সেখানে অবশ্য পাঠ্য ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং দর্শন সেখানে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। ১৯২০ সালে শিশু জ্যোতি ভর্তি হলেন সেই লোরেটো স্কুলে।

সাল ১৯২৫। জ্যোতি বড়ো হয়েছেন। ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। নাম দেখেই বুঝতে পারছেন যে সেটাও ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্থাপিত। সবই লোরেটোর মতো। আজকের সেন্ট জেভিয়ার্সের সঙ্গে ভুলেও তুলনায় যাবেন না। এখন তো অতি সাধারণ মানুষের ছেলে-মেয়েরাও সেখানে পড়ে।

জ্যোতি আরও বড়ো হলেন। সাল ১৯৩৫। পাড়ি দিলেন লন্ডন। ১৯৩৯ সালের ব্যারিস্টার হলেন মিডল টেম্বল থেকে। পড়াশোনা চলাকালীন রজনী পাম দত্ত, হ্যারল্ড জে লাস্কি সমেত বাম ঘরানার রাজনৈতিক নেতাদের এবং তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪০ সালের ১ জুলাই ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বয়স তখন তার প্রায় ২৬ বছর।

এবার আমরা দেখে নেব এই ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকসঙ্ঘের কেশব হেডগেওয়ারের জীবনের অংশ। ১৮৮৯ সালের নববর্ষের দিন যা 'যুগাদি' রূপে মহারাষ্ট্রে উদযাপিত হয়। সেই দিন নাগপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে কেশব জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন পুরোহিত। স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল, কিন্তু জন্মজাত দেশভক্ত। তার মতো ভাগ্যবান ক'জন? মাত্র আট বছর বয়সেই কেশব ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিতরণ করা মিষ্টি ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেটা ছিল ১৮৯৭ সাল।

কেশবের বয়স মাত্র ১২। সপ্তম এডোয়ার্ড রাজা হয়েছেন। ইংল্যান্ড এবং তার উপনিবেশগুলো জুড়ে চলছে উৎসবের জোয়ার। নাগপুরে তখন ইম্প্রেস মিল নামে একটি কারখানার উদ্যোগে রাজ্যাভিষেক পালন হচ্ছে। উৎসবের মুখ্য আকর্ষণ মিষ্টি বিতরণ। অথচ, এই বয়সেই বালক সঙ্গীদের নিয়ে দল তৈরি করলেন কেশব যাতে কোনো বালক সেই অনুষ্ঠানে না যায়। সেটা ১৯০১ সালের ঘটনা।

১৯০৫ সাল। কেশব তখন নিল সিটি হাইস্কুলের ছাত্র। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল। দেশপ্রেমিকদের মুখে একটাই স্লোগান, 'বন্দে মাতরম্'। কেশব ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালানোর পুরোহিত হয়ে উঠলেন। স্কুলে পরিদর্শক এলেন স্কুল পরিদর্শনে। কিন্তু পরিদর্শক যে বিদ্যালয় কক্ষে যান সেখানেই একটিই স্লোগান,... বন্দে মাতরম্। শাস্তি অনুমেয়। কেশব স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন।

কেশব এবার যাবেন কোথায়? তার বাবার তো অগাধ টাকা নেই। সেসময় মহারাষ্ট্রের কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা বিদর্ভের জেলা শহরে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নাম বিদ্যাগৃহ'। বিদ্যাগৃহ নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং পরম্পরা। অতি আনন্দে কেশব সেই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের নেকনজরে পড়ে এই স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। দেশেপ্রেমের মূল্য কীভাবে কেশব দিয়েছেন, এর চেয়ে আর কী বড়ো প্রমাণ হতে পারে? অন্য একটি স্কুল থেকে পাশ করলেন।

বন্ধুদের সঙ্গে পুনে বেড়াতে গিয়ে জানলেন যে কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপতি হয়েছে। বঙ্গের জাতীয়তাবাদী নেতারা এর প্রতিষ্ঠাতা। ভর্তি হলেন সেখানে। সেখান থেকে ডাক্তারি পাশ করলেন। কে স্বাক্ষর করেছিলেন ওই সার্টিফিকেটে, জানেন? আমি জানি, আপনারা অনেকে জানেন না। না, না জ্যোতিবাবুর সার্টিফিকেটে যেমন রাজা-রানির সই আছে, তেমনটি নয়। ওই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেছিলেন বিপ্লবী ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। সালটা ছিল ১৯০৯। তখন কেশবের বয়স ২০ বছর। এসেছিলেন তো ডাক্তারি পড়তে। কিন্তু রক্তে যার রয়েছে জন্মজাত দেশপ্রেম, তাকে কি শিক্ষায়তনের নিগড় আটকে রাখতে পারে? গোপনে যোগ দিলেন অনুশীলন সমিতিতে। তার ছদ্মনাম হলো 'কোকেন'। ব্রিটিশ পুলিশের চোখ এড়িয়ে কোকেন হয়ে উঠলেন মহারাষ্ট্র এবং বঙ্গপ্রদেশের বিপ্লবীদের যোগসূত্র। ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল থেকে সসম্মানে ডাক্তারি পাশ করলেন। তার নাম হলো তখন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ফিরে এলেন নাগপুরে। তিনি তখন ২৫ বছরের তরুণ। কোটি কোটি দেশভক্তদের নয়নের মণি ডাক্তারজী।

অন্য রকম

দিল্লির রাস্তায় হরজিন্দারের ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আধুনিকতার সঙ্গে কি হৃদয়বৃত্তির কোনও শত্রুতা আছে? পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালিরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিশ্চিত আমতা-আমতা করবেন। অন্তত কলকাতা শহরের হৃদয়হীনতার একটি ছবি তাদের চোখে ভেসে উঠবেই। ছবিটি এই রকম : ধরা যাক, কলকাতার কোনও ব্যস্ত রাস্তায় একটি দুর্ঘটনা ঘটল। এবং জনৈক পথচারী মারাত্মক আহত হলেন। অবশ্যই অনেকে দৌড়ে আসবেন। জল-টল দেবেন, জিজ্ঞাসা করবেন কোথায় লেগেছে। এরপর শুরু হবে আলোচনা।



কোন হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভালো হয় বা আজকাল অ্যাকসিডেন্ট অনেক বেড়ে গেছে...ইত্যাদি। কিন্তু বেশিরভাগই ওই আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন না। শেষপর্যন্ত যে গুটিকয়েক বেকার ছেলে এগিয়ে আসবেন তারা ট্যাক্সি পাবে না। এমনকী অ্যাকসিডেন্ট কেস শুনে মুখ ফেরাবে অটোচালকেরাও।

এবার যাওয়া যাক দিল্লিতে। ভারতের রাজধানী শহর কলকাতার তুলনায় আরও আধুনিক। আরও সবুজ। এবং তুলনায় আরও হৃদয়বান। কারণ এই শহরে একজন হরজিন্দার সিংহ থাকেন। তাঁর বয়েস ছিয়াত্তর বছর। তিনি পেশায় অটো ড্রাইভার। অন্য সকলের মতো তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে। পরিবারে হাজারো সমস্যা আছে। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও হরজিন্দার তাঁর মন এবং মানবিকতা হারিয়ে ফেলেননি। সারাদিন যাত্রী পরিবহণের কাজে ব্যস্ত থাকলেও বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর অটোটি হয়ে ওঠে অ্যাম্বলেন্স। ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স। অটোর গায়ে লেখা তাঁর ফোন নম্বর। দিল্লির যেখানেই অ্যাকসিডেন্ট হোক, ফোন পাওয়ামাত্র তিন চাকার অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ে দৌড়ন হরজিন্দার। পৌঁছে দেন হাসপাতালে।

দীর্ঘ বর্ণময় জীবনে হরজিন্দার অনেক রকম দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মধ্যে দুটির কথা বলার সময় হরজিন্দারের চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিজেই বলেন, 'আমি ছিলাম দিল্লি পুলিশের ট্রাফিক ওয়ার্ডেন। অটোরিকশা ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকও হয়েছি। ১৯৬৪ সাল থেকে আমি দিল্লির রাস্তায় অটোরিকশা চালাচ্ছি। পঞ্চান্ন বছর হয়ে গেল অথচ আজ অবধি ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য পুলিশ আমার বিরুদ্ধে কোনও কেস দেয়নি।' ট্রাফিক ওয়ার্ডেন কাকে বলে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেন হরজিন্দর। কথায় কথায় বলেন, 'ট্রাফিক ওয়ার্ডেনকে সেতু বলতে পারেন। যেমন আমি ছিলাম দিল্লির সাধারণ মানুষ এবং পুলিশের মাঝখানে সেতু। নাগরিকের সঙ্গে এরকম একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে জনমুখী সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হয়। তবে হ্যাঁ, একজন অটো চালককে ট্রাফিক ওয়ার্ডেন বললে কেমন অদ্ভুত শোনায়। সাধারণভাবে এরকম তো হয় না।'

এসব অবশ্য পুরনো ঘটনা। ইদানীং হরজিন্দার একাধিকবার খবরের শিরোনামে এসেছেন তাঁর অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের কারণে। যে অটোটি তিনি চালান তাতে প্রাথমিক চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা আছে। ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিসেপটিক লোশন, অ্যান্টি-বার্ন ক্রিম, প্যারাসিটামল— সবই পাওয়া যাবে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও হরজিন্দার নিয়েছেন। অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। কতদিন এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন জানতে চাইলে হরজিন্দার সোজাসাপটা উত্তর দেন, যতদিন বেঁচে থাকব।'

এমন একজন মানুষকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। বিশেষ করে আজকের এই যান্ত্রিক পৃথিবীতে হরজিন্দারের মতো কাউকে কল্পনা করাও যেখানে অসম্ভব। কিন্তু এই মানবিক মন কি হাওয়ায় জন্মায়? এর কি কোনও প্রেক্ষাপট নেই? জবাব দেন হরজিন্দার, 'আমার মনে আছে সেবার দিল্লিতে বন্যা হয়েছিল। শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দুর্গত মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করা হচ্ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে আমিও ছিলাম। যাইহোক, বন্যার জল তো একদিন সরে গেল কিন্তু মানুষকে তার বিপদের সময় সাহায্য করার ইচ্ছেটা আমাকে পেয়ে বসল। ওই সময়েই আমি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এখনও তা চলছে।'

আজ অবধি কতজনকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন সেই হিসেব হরজিন্দার রাখেন না। তাতে নাকি অহংকার বাড়ে! মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেও যিনি অহংকার করতে চান না তাকে কী বলা যায়? মানুষ না দেবতা? মানুষ বললেই হরজিন্দার খুশি হন। দেবতা হয়েও তিনি নিজেকে দেবতা ভাবতে চান না।

তুষ্টিকরণের জন্যই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা চালু করেছিলেন নেহরু

নারায়ণশঙ্কর দাস

ব্রিটিশ ভারতে ১৫টি প্রদেশ ছিল যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার গঠিত হতো। এভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ব্রিটিশ ক্রাউনের অধীনে থেকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এদেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ব্রিটিশ ভারতে অজস্র ছোটো বড়ো প্রায় ৫৬২টি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ব্যতিক্রমী কেবল জম্মু-কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং জুনাগড়। জম্মু ও কাশ্মীর ব্রিটিশ অধীনে একটি করদ রাজ্য যা সরাসরি ভারতের গভর্নর জেনারেলের অধীন ছিল। রাজা ছিলেন ডোগরা রাজা হরি সিংহ। অন্যদিকে গোয়া, দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি ছিল সম্পূর্ণ পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণে। আর ফরাসিদের ছিল পাঁচটি উপনিবেশ-চন্দননগর, ইয়ানাম, পুদুচেরি, কারাইকাল ও মাহে। যাই হোক, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটি আগে ছিল হিন্দু শাসক আর মুসলমান সুলতানদের অধীনে। পরে ১৫৫৬ সালে মুঘল সম্রাট আকবরের অধীনে আসে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন কাশ্মীর উপত্যকা দিয়ে। এই কাশ্মীরের পথ দিয়ে প্রবেশ করেই মহম্মদ গজনি সতেরোর ভারত আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করে। এটা ভারতের একরকম প্রবেশদ্বার। কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ সন্তান রঘুরাম কাউল। তাঁর নাতি হলেন শেখ আবদুল্লা। ১৭৫৬ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে আফগানরা এসে মুঘলদের বিতাড়িত করে। ১৮১৯ সালে এটি পঞ্জাবের শিখ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। এরপর ১৮৪৬ সালে মহারাজা রঞ্জিত সিংহ শুধু জম্মু এলাকাটি মহারাজ গুলাব সিংহের হাতে তুলে দেন লাহোর ও অমৃতসর চুক্তির মধ্য দিয়ে। শেখ আবদুল্লা এরপর ডোগরাদের বিরুদ্ধে 'কাশ্মীর ছাড়ো' আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। মহারাজা হরি সিংহের বিরুদ্ধে তিনি পুঞ্চ আন্দোলন চালান। এরপর পাকিস্তানি হানাদারেরা কাশ্মীর আক্রমণ করে। ১৯৪৭-এর ২৫ অক্টোবর হরি সিংহ ভারত সরকারের সঙ্গে কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আর ১৯৪৭-এর ২৬ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পন্ন হয়।

সাবেক জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ৬০ শতাংশ এখন ভারতের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। বাকি ৪০ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশ পাক অধিকৃত কাশ্মীর। আর ৫১৮০ বর্গকিলোমিটার পাকিস্তানের চীনকে অন্যায়ভাবে হস্তান্তরিত করা অঞ্চল এবং চীন অধিকৃত ৩৭৫৫৫ বর্গকিলোমিটার সমেত। ১৮৪৭ সালের ২২ অক্টোবরে পাক্ মদতপুষ্ট হার্মাদ বাহিনী হঠাৎ কাশ্মীর আক্রমণ করে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে যায়। রাজা হরি হিংহের সৈন্যদের ওপর আক্রমণকারীদের বাধা দেবার নির্দেশ থাকলেও তারা আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে হাত মেলায়। কাশ্মীরের রাজার সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ সিংহকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর তার মৃতদেহ লাইটপোস্টের মাথায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে আত্মরক্ষার জন্য তখন মহারাজা হরি সিংহ ভারতের সাহায্য চান। এজন্য প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনকে তড়িঘড়ি দিল্লি পাঠান। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু তাঁকে জানান যে রাজা হরি সিংহ ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেননি এবং সেই কারণেই ভারত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তড়িঘড়ি মহাজন কাশ্মীরে ফিরে যান এবং ২৫ অক্টোবরে ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন -এ স্বাক্ষর নিয়ে দ্রুত ফেরেন। রাজা হরি সিংহ স্বাক্ষর দিয়ে পৃথক চিঠিতে জানান যে তিনি আন্তরিকভাবেই ভারতে যোগ দিচ্ছেন। এভাবেই ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর কাশ্মীর হয়েছে ভারতের অঙ্গরাজ্য। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু লিখেছেন—''The Instrument of Accession signed by Hari Singh on the 25th October 1947, was in the same form as was executed by the meters of the numerous other states which had acceded to India."

এদিকে ২২ অক্টোবর ১৯৪৭ থেকে জম্মু-কাশ্মীরের অন্যায় দখলদারি নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার সৃষ্ট আগ্রাসী যুদ্ধ থামছে না দেখে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে পণ্ডিত নেহরু এ বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে আবেদন জানান। ১৯৪৯ সালের জুলাই-এ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। আর এই চুক্তি অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ভারতের তৎকালীন আইনসভা ভারতীয় সংবিধানে ৩০৬(এ) ধারা যুক্ত করে জম্মু-কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অস্থায়ীভাবে মেনে নেয়। এরপর ১৯৫০-এর ১৫ ডিসেম্বর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যু হয়। তার পরই ১৯৫১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি একছত্র ক্ষমতার অধিকারী পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে সোজা চলে যান রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে। অনেকের নিষেধ উপেক্ষা করে জাতীয় সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক রূপ দিয়ে জটিল করে তোলেন। জানা যায়, সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকর সংবিধানে ৩০৬ (এ) ধারার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি উক্ত অনুচ্ছেদের খসড়া পর্যন্ত তৈরি করতে অস্বীকার করেন। সে সময় প্রধানমন্ত্রী

ফঃ ৬

নেহরু উক্ত অনুচ্ছেদের খসড়া তৈরি করার জন্য শেখ আবদুল্লাকে আম্বেদকারের কাছে পাঠালে আম্বেদকার পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছিলেন— ''Mr. Abdullah, you want that India should defend Kashmir, India should develop Kasmir and Kashmiris should have equal rights as the citizens of India but you don't want India and any citizen of India to have any rights in Kashmir. I can not betray the interest of my country.'' এর ফলে শেখ আবদুল্লা হতাশা নিয়ে ফিরে যান পণ্ডিত নেহরুর কাছে। এরপর নেহরুর নির্দেশে এই ধারায় খসড়া তৈরি করেন গোপাল স্বামী আয়েঙ্গার। ১৯৫২ সালের ২৪ জুলাই শেখ আবদুল্লা ও জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে এক চুক্তির মাধ্যমে উপরোক্ত ৩০৬ (এ) ধারা বদল করে ৩৭০ ধারার জন্ম দেওয়া হয়। ভারতীয় সংবিধানের ২১ তম অধ্যায়ে মোট ২৩টি ধারা রয়েছে— ৩৯৬ ধারা থেকে ৩৯২ ধারা পর্যন্ত। এই ধারাগুলির শিরোনাম Temporay Provision with respect to the State of Jammu and Kashmir. সুতরাং ৩৭০ নম্বর ধারাটি অস্থায়ী, পরিবর্তনসূচক এবং বিশেষ চুক্তি। দীর্ঘ ৬৭ বছর পেরিয়ে অবশেষে এই অস্থায়ী ধারাটি অ৫ আগস্ট ২০১৯-এ বিলুপ্ত হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো এক দেশ, এক নিশান, এক সংবিধান। পাশাপাশি ৩৫-এ ধারাটিরও অবলুপ্তি ঘটলো। ৩৫এ ধারায় বলা হয়েছে, কাশ্মীরে জমিজমা ও সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয় করার অধিকার থাকবে শুধু কাশ্মীরবাসীর। আসলে সংবিধানের ৩৫এ ধারা সাংবিধানিক ভুল, সংসদীয়ভাবে নয়। অনেকটা ১৯৭৬ সালে মন্ত্রীসভার অবলুপ্তিতে এবং জরুরি অবস্থা চলাকালীন ৪২তম সংবিধান সংশোধনে যেভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে সেক্যুলার ও সোশ্যালিস্ট শব্দ দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, অনেকটা সেইভাবে ৩৫এ ধারাটি নেহরুর হটকারিতায় এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নির্দেশে তা বলবৎ হয়েছিল। এই ধারা সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা সাম্যের অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। যেমন, জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের নেতা ফারুক আবদুল্লা এবং পুত্র ওমর আবদুল্লা বিয়ে করেন অকাশ্মীরি মহিলাকে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের নেতা ফারুক আবদুল্লার মেয়ে সারা আবদুল্লা বিয়ে করেন কংগ্রেস নেতা শচিন পাইলটকে এবং সারা আবদুল্লার কাশ্মীরে স্থায়ী বাসিন্দা এবং পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার হারিয়ে ফেলেন শুধু মাত্র সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারার ওপর নির্ভর করে ৩৫এ ধারা তৈরি হওয়ায়। জম্মু-কাশ্মীরে ১৯৫৬ সালের ১৭ নভেম্বর সংবিধান আংশিকভাবে কার্যকর হয়। সংবিধান সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয় ১৯৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারি। জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য সংবিধানে মোট ১৫৮টি ধারা, ১২টি খণ্ড ও ৭টি তপশিল রয়েছে। আর উক্ত সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও বলা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতের সংবিধানে মোট ৩৯৫টি ধারা রয়েছে। তার মধ্যে ১৩৫টি ধারা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে প্রযোজ্য নয়। সাংবিধানিক অচলাবস্থা দেখা দিলেও জম্মু-কাশ্মীর এমন একটি রাজ্য যেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় না। এমনকী রাষ্ট্রপতিরও ক্ষমতা নেই রাজ্যের সংবিধান বাতিল করার। এছাড়াও আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করার জন্য ভারতের পার্লামেন্ট আইন রচনা করতে পারলেও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের সম্মতি নিতে হয়। অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ ৫ বছর কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে তা ৬ বছর। সব কিছুতেই কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সুবিধা ছিল যদিও সেসব সাময়িক। জম্মু-কাশ্মীরের আলাদা সংবিধান, আলাদা পতাকা এবং আলাদা মানসিকতা যা পাকিস্তান প্রেম নামে খ্যাত।

ভাবলে অবাক লাগে, ১৯৪১-এর জনগণনায় যেখানে শ্রীনগর উপত্যকায় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সংখ্যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ, সেখানে ১৯৮১ সালের জনগণনায় সে সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫ শতাংশে। এরপর ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘু কাশ্মীরি পণ্ডিত বিতাড়নের ফলে সেই সংখ্যা কাশ্মীর উপত্যকায় এখন হাতে গোনা যায়।

যাই হোক, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়, পরের বছর ১৯৬৬ সালে জানুয়ারি মাসে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। ১৯৭১-এর পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও যুদ্ধ লাগলে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে সে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সবের ফলে জম্মু-কাশ্মীরে দুই প্রতিবেশী দেশের যুদ্ধবিরতি রেখার বদলে এক নতুন নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) দ্বিপাক্ষিকভাবে কার্যকর হয়। জম্মু-কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর আর শীতকালীন রাজধানী জম্মু। জনসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯২৬ জন। জম্মু-কাশ্মীরে মুসলমান জনসংখ্যা রাজ্যের ৬৭ শতাংশ। কাশ্মীরের সরকারি ভাষা উর্দু, তাছাড়াও রয়েছে ডোগরি, লাদাখি প্রভৃতি।

সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ অস্থায়ী ধারা দুটি বাতিল করা মানেই কিন্তু কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তিকরণকে অস্বীকার করা নয়। কেননা জম্মু-কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তিকরণের সময় রাজা হরি সিংহের সঙ্গে বিতর্কিত ধারা দুটি নিয়ে বিন্দুমাত্র আলাপ আলোচনা হয়নি। এমনকী এ জাতীয় কোনো শর্তও ছিল না। স্বাধীনতার সময় জম্মু-কাশ্মীর একমাত্র মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্য হলেও সে রাজ্য ছিল হিন্দু রাজা হরি সিংহের অধীনস্থ। জম্মু-কাশ্মীরের জন্য বিশেষ আইনে সম্মতি প্রদানকারীদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্মতি দিয়েছিলেন তখনই যখন আইনটিকে সাময়িকভাবে বলবৎযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এমনকী সে সময় স্বয়ং জওহরলাল নেহরু সরকারিভাবে বিবৃতি দিয়েছিলেন--- ''Special Status of Jammu and Kashmir would fade away with time.'' কাজেই সংকীর্ণ সংখ্যালঘু তত্ত্বে বিশ্বাসী প্রাক্তন মুখমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি যখন মন্তব্য করেন— ''Any tampering of article 370 and 35(A) will render treaty of accession null and void.'' তখন তা দেশদ্রোহিতা বলেই মনে হয়। ■

বাংলাদেশে বিরোধিতার মুখে 'ইসকন'

ধীরেন দেবনাথ

রথযাত্রা উৎসব শেষ। কিন্তু এবার বাংলাদেশে রথযাত্রা নিয়ে ঘটেছে এক সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা। খবরে প্রকাশ, অন্যান্যবারের মতো এবারও বাংলাদেশে রথযাত্রা উৎসব পালন করে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘ বা 'ইসকন'। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর জামাত তথা পাকপন্থী রাজাকার, আলবদর ও কট্টর ইসলামপন্থী, হিন্দু বিদ্বেষী ধর্মগুরু। তারা 'ইসকন'-এর বিভিন্ন কার্যকর্তাকে আসামি করে আদালতে মামলা পর্যন্ত করেছে। মামলাকারীদের অভিযোগ, ৩০ জুন একদল 'ইসকন' সদস্য রথযাত্রার নামে ভোর ৪টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে বাদ্য-বাজনা করে। ফলে ৫ বারের নামাজ বিঘ্নিত হয়। নামাজের সময় বাদ্য-বাজনা বন্ধ রাখার অনুরোধ জানালে উদ্যোক্তার তাতে কর্ণপাত না করে উল্টে দুর্ব্যবহার এবং মারধর করেন। এমনকী তারা পার্শ্ববর্তী পাঁচ শতাব্দী পুরানো স্বামী বাগ মসজিদে ঢুকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এছাড়াও ইদের আগের দিন ঢাকার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম্-এর গেটের কাছে রথযাত্রার মিছিলকারীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিকট শব্দে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে নানা অভব্য অঙ্গভঙ্গি, হইচই ও চিৎকার-চেঁচামেচি করে যা সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করে। তাদের আরও অভিযোগ, 'ইসকন' তাদের 'ফুডফর লাইফ' কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে (৮-১৬ জুলাই) চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাবার বিতরণের নামে প্রসাদ বিতরণ করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' মন্ত্র বলতে বাধ্য করে, যাদের অধিকাংশ মুসলমান। আবার সিলেটের কাজলাশাহ্ মসদিদে নামাজ আদায়ের সময় 'ইসকন'-এর লোকজন উচ্চ শব্দ করে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকলে ও গানগাইতে থাকলে নামাজ পাঠে বিঘ্ন ঘটে। নামাজ পাঠের সময় বাদ্য-বাজনা বন্ধ রাখার অনুরোধ করলে তারা উল্টে তাদের উপরেই হামলা চালায়। তাতে ২০ জন আহত হয়। আসামিদের এহেন উস্কানিমূলক ক্রিয়াকলাপ কোটি কোটি মুসলমানের ধর্মীয় ভাবাবেগকে প্রচণ্ড আঘাত করছে। 'ইসকন'-এর এরূপ কার্যকলাপ ওইদেশ ও সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে যে কোনো মুহূর্তে অশান্ত করে তুলতে পারে। তাই বাংলাদেশে 'ইসকন'-এর ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা একান্ত জরুরি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, রথযাত্রার দিন ওরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি।

এর পাল্টা হিসেবে 'ইসকন'-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের কোথাও কোনো মুসলমান শিক্ষার্থীকে প্রসাদ খাওনো হয়নি, কাউকে 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম' মন্ত্র বলতেও বাধ্য করা হয়নি। চট্টগ্রামে 'ইসকন' তাদের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে 'ফুড ফর লাইফ' কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'প্রসাদ' নয়, খাবার বিতরণ করেছে। আর 'স্যোশাল মিডিয়া'য় যাদের মন্ত্রোচ্চারণ করতে দেখানো হয়েছে, তারা ভক্তি বেদান্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং সবাই হিন্দু। তাছাড়া 'মিডিয়া' যে স্কুলের নাম দিয়ে প্রসাদ খাওয়ানোর অভিযোগ করেছে তার অধ্যক্ষ বিভিন্ন মাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাঁর স্কুলের কোনো মুসলমান শিক্ষার্থীকে ওই খাবার দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, রথযাত্রার শুভেচ্ছা স্বরূপ 'ইসকন' এবারও দশটি স্কুলের হিন্দু শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেছে এবং এবারই তাদের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ— প্রশ্ন বিদ্ধ করা হয়েছে তাদের সেবামূলক কার্যক্রমকে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য সরকারের কাছে সঙ্ঘের সাধু-সন্ন্যাসীদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে 'ইসকন'-এর বিরুদ্ধে মিথ্যে খবর প্রকাশের জন্য কয়েকটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। তবে আনন্দের খবর, অভিযোগকারীদের করা মামলাটি শুনানির শেষে মহামান্য আদালত খারিজ করে দিয়েছেন। একেই বলে, 'রাখে হরিমারে কে?' 'সত্যমেব জয়তে'। মনে রাখতে হবে, রাম ও কৃষ্ণ বিশ্বমানবকে দেখাবে সত্যের পথ। হিন্দুত্ব করবে বিশ্বজয়। সত্যি বলতে কী, বাংলাদেশে হিন্দুবিরোধী স্বাধীনতার শত্রুদের উত্থান ক্রমবর্ধমান, সেদেশে হিন্দুরা তথা সংখ্যালঘুরা অস্তিত্বহীনতায় ভুগছে। তারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। বোধহয় বিলুপ্তির পথে। তাছাড়া বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার চক্রান্ত চলছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের একাংশের অভিমত, বাংলাদেশে হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে হাসিনা সরকারের পরোক্ষ ইন্ধন। কারণ হাসিনা ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে স্বাধীনতার শত্রু জামাতিদেরও সমর্থন চাইছেন। তাই তিনি তাদের তোল্লা দিচ্ছেন। তারা ও শাসকদলের একটা বড়ো অংশ হাত মিলিয়ে বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু হাসিনা চুপ। তাঁর স্বপ্ন, বাংলাদেশকে সর্ব বৃহৎ মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত করা, যা এখন ইন্দোনেশিয়া। কিছু মুসলমান দেশ-সহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রয়েছে 'ইসকন'-এর উপস্থিতি। এর 'ফুড ফর লাইফ' ও 'কৃষ্ণ প্রসাদম্' ওই সব দেশে সমাদৃত। আফ্রিকার দুর্ভিক্ষময় দেশগুলিতে ওই কর্মসূচি দারুণ জনপ্রিয়। ক্ষুধার্তরা উপকৃত। অথচ বাংলাদেশের 'জেহাদি' মুসলমানদের কাছে এই কর্মসূচি প্রশ্নবিদ্ধ। মূর্খ আর কাকে বলে? ▌

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার বিনিয়োগে সরকার উৎসাহ জোগাবে ঃ রাজনাথ সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার বিনিয়োগে উৎসাহ দানের ব্যাপারে সরকারের আগ্রহের ব্যাপারে জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। গত ৯ আগস্ট নতুন দিল্লিতে প্রতিরক্ষা ও অ্যারো স্পেস সংস্থাগুলির সিইও-দের এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিরক্ষা শিল্পে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক এক আলোচনায় তিনি জানান, রপ্তানির পাশাপাশি দেশীয় বাজারে অবদান রাখার বিপুল সুযোগ প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির রয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে কৌশলগত অংশীদারিত্ব মডেলের কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় সংস্থাগুলি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ও স্বচ্ছতা প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে অংশীদার সংস্থা নির্বাচন করতে পারবে। তিনি জানান, সরকার প্রতিরক্ষা



ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি উদারীকরণ এনেছে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলির অংশগ্রহণের সংখ্যা আগের থেকে বেড়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে শ্রী সিংহ প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানিতে উৎসাহ দিতে শিল্প সংস্থাগুলিকে ভারতের মৈত্রীভাবাপন্ন দেশগুলিতে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান, রপ্তানি নীতি সরল করা হয়েছে এবং দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ তথা এধরনের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনে উৎসাহ দিতে ২০১৬-তে সংশ্লিষ্ট নীতি সংশোধন করা হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন ও অগ্রগতি ছাড়া প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করে শ্রীসিংহ দেশে এ ধরনের প্রযুক্তির অরও উন্নয়ন ও বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। এক পরিসংখ্যানে তিনি বলেন, ২০১৮-১৯-এ ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পসংস্থাগুলির উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য ছিল ৮০ হাজার কোটি টাকা। এরমধ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলি ১৬ হাজার কোটি টাকার অবদান রেখেছে। এই বৈঠকে বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীপাদ যশো নায়েক ছাড়াও মন্ত্রক, প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ডায়রিয়াজনিত শিশুমৃত্যু রোধে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নবনির্বাচিত সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনার আওতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক এক উচ্চ পর্যায়ের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ৩৬ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সর্বত্রই প্রতিটি শিশুকে রোটা



ভাইরাস টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সারা দেশে রোটা ভাইরাস টিকা প্রদান সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষ বর্ধন একথা জানন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রেরণামূলক নেতৃত্বদানের মাধ্যমে সরকার ২০২২ সালের মধ্যে ডায়রিয়ার কারণে শিশুমৃত্যু রোধে এবং ডায়রিয়া জনিত অসুখ থেকে শিশুদের বাঁচাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশের শিশুদের জন্য নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি এই কর্মসূচির ফলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।

তিনি আরও বলেন, শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ ডায়রিয়া। দু'বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণই হলো রোটা ভাইরাস সংক্রমণ। ডায়রিয়া জনিত শিশুমৃত্যু ও অসুস্থতার হার কমানোর ক্ষেত্রে রোট ভাইরাস টিকা প্রদানের পাশাপাশি যথাযথ সুঅভ্যাস গড়ে তোলা, নিয়মিত হাত ধোয়া, ওআরএস মিশ্রিত জল সেবন এবং জিংক সমৃদ্ধ পরিপুরক পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্পূর্ণ টিকাকরণ কর্মসূচির সম্প্রসারণে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানিয়ে ডাঃ হর্ষ বর্ধন বলেন, জীবনদায়ী বিভিন্ন টিকার সুবিধা প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন। টিকা প্রতিরোধী অসুখের কারণে মৃত্যুর কবল থেকে প্রতিটি শিশুকে রক্ষা করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। শিশু মৃত্যুর হার কমাতে এবং শিশুদের জন্য এক স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

এক পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, দেশে এখনও প্রতি বছর ১ হাজার শিশুর মধ্যে ৩৭ জন তাদের জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে পারে না। এর অন্যতম কারণই হলো ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই রোটা ভাইরাস টিকা ৩৬ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিশুদের দেওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সপ্তম বৈঠক নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ায় আসাদুজ্জামান খানকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কর্মসূচিতে ভারত আবারো পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের আবহে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গড়ে ওঠা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কৌশলগত দিক ছাড়াও আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে বলে দু-দেশের মন্ত্রীরা মত প্রকাশ করেন। বর্তমানে এই সম্পর্ক গোটা বিশ্বের কাছে আদর্শ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের



দৃষ্টান্ত স্বরূপ। আর এটি সম্ভব হয়েছে উভয় দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, উন্নয়নমূলক সহযোগিতা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্যর জন্য। বৈঠকে উভয়মন্ত্রী নিরাপত্তা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা-সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করায় সন্তোষ ব্যক্ত করেন। সীমান্তে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখার ব্যাপারে তাঁরা পুনরায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। দুটি দেশের সীমান্তে প্রহরারত বাহিনীর মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার উভয়েই প্রশংসা করেন। বাংলাদেশ তার ভূখণ্ডে, ভারত-সহ অন্য কোনো দেশে জঙ্গি তৎপরতা এবং নাশকতামূলক কাজ করতে না দেওয়ায় অমিত শাহ তার প্রশংসা করেন।

বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা জনিত সহযোগিতার বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। সীমান্ত এলাকায় অপরাধ মোকাবিলা করে নিরাপত্তা বজায় রাখতে দু-দেশের আরও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে বলে উভয় পক্ষই সহমত পোষণ করেছে। সীমান্তের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোর জন্য বকেয়া নানা বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উভয়পক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উপর জোর দেয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ উপযুক্ত নথি ছাড়া সীমান্তে অবৈধভাবে ঘোরাঘুরি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মূলত উত্তরপূর্ব ভারতে এই সমস্যার সমাধানের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। বাংলাদেশের মায়ানমার থেকে আসা শরণার্থীদের নিরাপদে দ্রুত প্রত্যার্পণের বিষয়ে ভারত- বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে চারবার ভারত ওই শরণার্থীদের জন্য মানবিক ত্রাণ সাহায্য পাঠিয়েছে। দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও পর্যটন সহ নানা কারণে ভ্রমণের উপর উভয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভারতীয় মহাকাশ চর্চার জনক ড. বিক্রম সারাভাইয়ের জন্মশতবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইসরো শুধুমাত্র ভারতের মহাকাশ চর্চাকেন্দ্র নয়, এই প্রতিষ্ঠান ভারতের গর্বের। কিন্তু ইসরোর প্রতিষ্ঠাতার নাম আমরা ক'জন জানি? ড. বিক্রম সারাভাইয়ের হাতে প্রাণ পেয়েছিল ইসরো। তিনি ছিলেন ভারতের মহাকাশ চর্চার জনক। গত ১২ আগস্ট ড. বিক্রম সারাভাইয়ের জন্মশতবার্ষিকী পূর্ণ হলো। এই উপলক্ষ্যে ইসরো বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ১২ আগস্ট যার সূচনা হয়েছে আমেদাবাদের গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেনশন

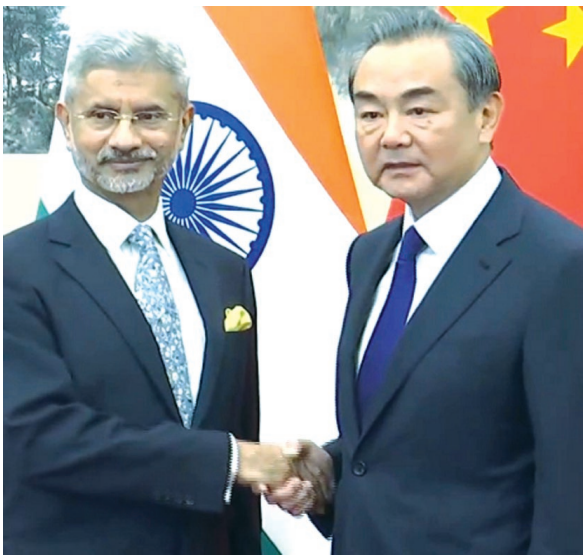


হলে। আমেদাবাদ ড. বিক্রম সারাভাইয়ের জন্মস্থান। অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিষয়ক প্রদর্শনী, স্কুলপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান নিয়ে যেসব সাংবাদিক লেখালেখি করেন তাঁদের সম্মানজ্ঞাপন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মত বিনিময়।

ইসরো প্রতিষ্ঠা করে ড. বিক্রম সারাভাই তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইসরোর বিজ্ঞানীদের সৌজন্যে এখন ভারতের নাম আন্তর্জাতিক মানচিত্রে উজ্জ্বল। এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছে কারণ ড. সারাভাই তৎকালীন ভারত সরকারকে মহাকাশচর্চার গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ড. সারাভাই এমনই একজন মানুষ যিনি কোনওদিন মহাকাশচর্চায় অগ্রগণ্য দেশগুলির সঙ্গে রেষারেষির জন্য চাঁদে বা অন্য কোনও গ্রহে রকেট পাঠাবার কথা ভাবেননি। বস্তুত, তিনি সামাজিক মানুষ ও ব্যক্তিমানুষের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা বলতেন। ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্টের সফল উৎক্ষেপণের প্রেক্ষাপটে রয়েছে তাঁর অবদান। তিনিই প্রথম আমেরিকার মহাকাশ চর্চাকেন্দ্র নাসার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। যদিও তিনি আর্যভট্টের উৎক্ষেপণ দেখে যেতে পারেননি। ১৯৭৫ সালে আর্যভট্ট কক্ষপথে প্রতিস্থাপিত হয়। তার আগেই পরলোকগমন করেন ড. বিক্রম সারাভাই।

ভারত-চীন সম্পর্ক স্থিতিশীলতার উদাহরণ হওয়া উচিত : এস. জয়শঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সারা পৃথিবীতে যখন অনিশ্চয়তার বাতাবরণ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, ভারত ও চীনের সম্পর্ক সেখানে স্থিতিশীলতার



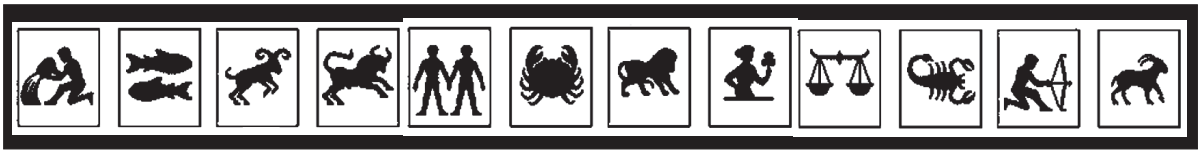
সর্বোত্তম উদাহরণ হওয়া উচিত। মন্তব্যটি ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের। সম্প্রতি তিনদিনের চীন সফরে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর তিনি এই মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই এস. জয়শঙ্করের প্রথম বিদেশ সফর। চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিঙের বিশ্বাসভাজন হিসেবে পরিচিত, সে দেশের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং উই-র সঙ্গে বৈঠক করেন এস. জয়শঙ্কর।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'দু'দেশের সম্পর্ক যে আরও স্থিতিশীল হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দু' বছর আগে আসটানায় অনুষ্ঠিত সামিটে ভারত ও চীনের শীর্ষনেতারা সহমত পোষণ করেছিলেন। আমার সৌভাগ্য আমি তারপরে এসেছি।' সম্প্রতি ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরে লাগু ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিল করেছে। সিদ্ধান্তটি আন্তর্জাতিক স্তরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। যেহেতু এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভারত এবং চীনের ভৌগোলিক সীমার বিষয়টি জড়িতে, বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। এস. জয়শঙ্কর বলেন, 'ভারত নিজের ভূখণ্ডে কী করবে না-করবে সেটা তার অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে ভারত ভৌগোলিক সীমা বদল করার কথা ভাবছে না।' উল্লেখ্য, এ বছরের শেষদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং ভারত সফর করবেন। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর আলোচনা হবে।

সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী ইস্তেহারে সাংসদ এবং বিধায়কদের আচরণবিধির বিষয়কে যুক্ত করার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উপ-রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে সাংসদ, বিধায়ক-সহ সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য আচরণবিধি যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই আচরণবিধিতে সভাকক্ষে জনপ্রতিনিধিদের যে কোনো অভব্য আচরণ থেকে বিরত থাকার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে— সভাকক্ষের ওয়েলে নেমে না আসা, অধিবেশন চলার সময় স্লোগান দিয়ে কাজকর্মে বিঘ্ন না ঘটানো এবং কাগজ না ছিঁড়ে ফেলা। উপ-রাষ্ট্রপতি ভবনে আজ শ্রী নাইডু রাজ্যসভার উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মধ্যাহ্নভোজের আসরে যোগ দেন। সংসদের সদ্য সমাপ্ত অধিবেশন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে বলে উল্লেখ করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, এই অধিবেশনে রাজ্যসভায় প্রশ্ন উত্থাপন, তার জবাব দেওয়া, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এবং জিরো আওয়ারে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় সংখ্যার নিরিখে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্যসভার অধিবেশনে ৩৫টি কর্মদিবসে ৩২টি বিল অনুমোদিত হয়েছে যা, গত ১৭ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সাংসদরা সংসদের এই ফলপ্রসূ অধিবেশনের বিষয়ে প্রশংসা করবেন বলে তাঁর আশা। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বলেন, সভার সদস্যদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। সংসদের কাজকর্মে কোনরকমের বিঘ্ন ঘটানো উচিত নয়। সাংসদরা সভার কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটালে জনগণ অসন্তুষ্ট হন। কোনও কোনও রাজ্যে বিরোধী দলের সদস্যদের অধিবেশন বয়কট করার প্রবণতায় উপ-রাষ্ট্রপতি অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। কোনও কোনও রাজ্য বিধানসভায় অধিবেশন খুব কম দিন বসে, কোথাও আবার লাগাতার ব্যাঘাত ঘটানো হয়। শ্রী নাইডু বলেন, রাজনৈতিক দলগুলির খেয়াল রাখা উচিত যে তারা পরস্পরের বিরোধী— শত্রু নয়। ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের মধ্যে মতবিনিময় নিয়মিত হলে সংসদ এবং সাংবিধানিক সভাগুলি সুষ্ঠুভাবে চলবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, দেশের ভালোর জন্য তাঁরা বিভিন্ন আইন পাশ করেন এবং জনস্বার্থ সংবলিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যার মাধ্যমে সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



১৯ আগস্ট (সোমবার) থেকে ২৫ আগস্ট (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, কর্কটে বুধ, সিংহে রবি, মঙ্গল, শুক্র, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মীনে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র থেকে বৃষে মৃগশিরা নক্ষত্রে।

মেষ : বৈষয়িক প্রগতি, ধনার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি। গৃহে আত্মীয় সমাগম, প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়াসে জগতের আনন্দযজ্ঞে যোগদান, সম্মান ও শংসা। শারীরিক অসুস্থতা ও মনসংযোগের অভাব হেতু শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভে প্রতিবন্ধকতা। প্রতিষ্ঠানের প্রধান রিসার্চ স্কলার, আইনজ্ঞ, সার্ভেয়ার, শিল্পীর প্রতিভার ব্যাপ্তি, প্রতিষ্ঠা, সম্ভ্রম।

বৃষ : পেশাদার জীবনে একাধিক নতুন যোগাযোগ। কর্তৃপক্ষের সুধাময় দৃষ্টি, নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। পুরানো ঋণের সুরাহা, গুরুজনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি, শত্রুতা, সমালোচনা, প্রেমানন্দে প্লাবিত মন ও দূর ভ্রমণের সফল প্রয়াস। অনিদ্রা, স্নায়বিক দুর্বলতা, অপছন্দের ক্ষেত্র থেকে অস্বস্তি।

মিথুন : কর্মক্ষেত্রে জটিলতা, ব্যস্ততা, পারিপার্শ্বিক কারণে মানসিক অস্থিরতা ও নিকটজনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। সন্তানের ধারাবাহিক সাফল্যে আনন্দ। সন্তান সম্ভাবনার প্রতিকূল সময়। সপ্তাহের প্রান্তভাগে ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিমত্তা, মেধা ও দক্ষতায় নব বসন্তের পরশ। বেকার ও অবিবাহিতের সফল প্রয়াস।

কর্কট : ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির আপ্যায়ন রক্ষা করুন। ব্যক্তিত্বের কাছে শত্রুপক্ষ নতি স্বীকার করবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বে পালনে সতর্কতা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ শুভ। সন্তানের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি। মাতুলের স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগ। স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় পারিবারিক সুস্থিতি।

সিংহ : পেশাদারদের দূরস্থানে বদলির সম্ভাবনা। কর্মদক্ষতার অভিনব প্রয়াসে প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার। ব্যবসায় নব উদ্যোগের বাস্তবায়ন। ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারের অভীষ্টসিদ্ধি। ভোগ, আড়ম্বর তথা পার্থিব সুখে অতিবাহিত সময়।

কন্যা : উর্বর চিন্তা, মেধার বিকাশ, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ। সন্তানের আচরণ মনঃকষ্টের কারণ। সহোদরের প্রতিষ্ঠার সংবাদ আনন্দের। গৃহ ও বাহন যোগ তবে রমণীর কুহকে অর্থ ও সময়ের অপচয়।

তুলা : পারিবারিক অসুস্থতা নিকটজনের মন্দ ব্যবহরে। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার স্বীকৃতি ও শংসা। নিকট ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ। নতুন প্রেমজ সম্পর্কে উৎসাহ। আর্থিক দুর্বলতায় ঋণবৃদ্ধি। খনিজ, রাসায়নিক ও তরল উদ্যোগপতির শুভ। চিত্রকর অভিনেতা সংগীত শিল্পীদের সৃজনশীলতার ব্যাপ্তি, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব।

বৃশ্চিক : সহোদর ও প্রতিবেশীয় অবিধিপূর্বক আচরণ অভিমানের পরিবর্তে শান্ত-সংযত ও বুদ্ধিমত্তায় কীর্তিমানের পরিচয় দিন। সরলতা ও স্নেহপ্রবণ মনের করণে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক স্থিতি আভিজাত্য বৃদ্ধির সহায়ক। বিদ্যার্থীর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

ধনু : স্বজন সম্পর্কে উন্নতি, স্ত্রীর বুদ্ধি সাংসারিক সমৃদ্ধির সহায়ক। কর্মক্ষেত্রে প্রভাব বৃদ্ধি হলেও আর্থিক লাভ আশানুরূপ নয়। গুরুজনদের বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় উদ্বেগ। ধর্ম-কর্ম ও সমাজকল্যাণে মানবিকতার প্রকাশ ও শংসা। প্রেমজ ব্যাপারে জটিলতা ও মুখমণ্ডলের পীড়ায় ক্লেশ।

মকর : কর্মব্যস্ততায় মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি। পাওনা আদায়ে বিলম্ব, ভ্রাতা-ভগিনীর কোনো শুভ খবরে আনন্দ। নিজ স্পষ্টবাদিতায় লোকপ্রিয়তা অর্জন। লিখিত চুক্তি ও আর্থিক লেনদেন স্থগিত রাখা শ্রেয়। গুরুজনের পরামর্শ ও সহযোগিতায় নতুন ব্যবসার সূচনা। নবনির্মাণ, বাহন ক্রয় ও দেবপূজায় আর্থিক সহযোগিতার প্রাপ্তি।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা, অনুমান ক্ষমতা ও নিষ্ঠা সাফল্যের সহায়ক। স্বপরিবারে তীর্থ দর্শনের লোভনীয় হাতছানি। প্রতিবেশী ও সহোদরের মন্দ ব্যবহারে ব্যথিত বোধ হলেও বড়ো কোনো কাজে মিত্রের সহযোগিতা লাভ। অবৈধ প্রেমজ যোগাযোগ পরিহারে চঞ্চল মানসিকতা থেকে মুক্তি। স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় বিরোধিতা হ্রাস।

মীন : কর্মক্ষেত্রে জটিল সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের শংসা, আত্মবিশ্বাস ও বিজয়ীর সম্মান। সামাজিক কর্মকাণ্ডে মানবিক সখ ও নতুন চিন্তা-ভাবনার উদ্ভাবন। বিদ্যার্থীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ— যাতে সমাজ উপকৃত হবে। প্রেম-প্রণয়ীও পত্নী রূপের সার্থক প্রকাশ। হঠাৎ প্রাপ্তি ও বয়স্ক মিত্র হিতকারী নহে।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৬

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী ত্যাগীবরানন্দ, জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - চিহ্নায়ন ● **রন্তিদেব সেনগুপ্ত** - অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি
প্রবাল চক্রবর্তী - মহিষাসুর নির্ণাশী ● **জিষ্ণু বসু** - লিপা

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - ধুলো

গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, মালিনী চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
গোপাল চক্রবর্তী

ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে

প্রবন্ধ

বিজয় আঢ্য, অচিন্ত্য বিশ্বাস, রঙ্গা হরি, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, অর্ণব নাগ, জয়ন্ত ঘোষাল,
সুজিত রায়, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বসু।

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা